ডিজিটাল প্রযুক্তি

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

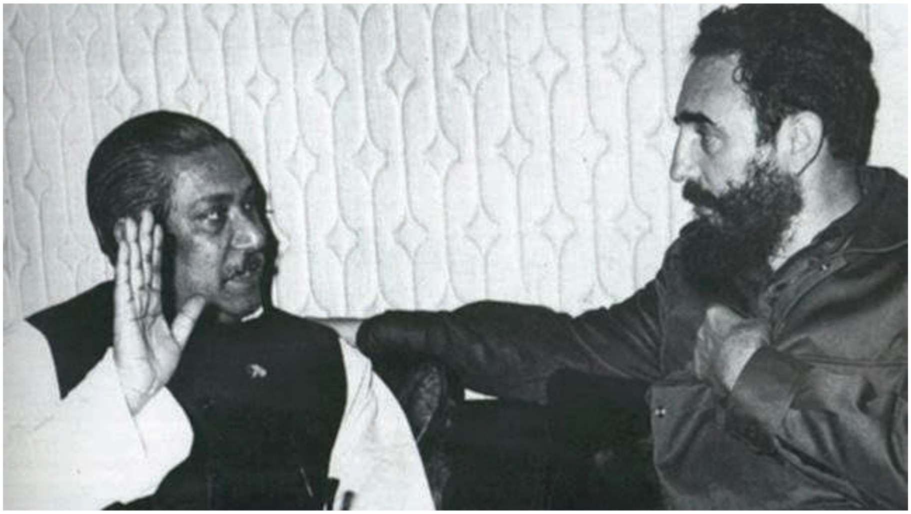

১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) চতুর্থ সম্মেলনে
কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"আমি হিমালয় দেখিনি
কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি,
ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতায়
তিনিই হিমালয়"
– ফিদেল ক্যাস্ট্রো

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ডিজিটাল প্রযুক্তি

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

অধ্যাপক ড. এম. তারিক আহসান
অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল
ড. ওমর শেহাব
মির্জা মোহাম্মদ দিদারুল আনাম
আফিয়া সুলতানা
মিশাল ইসলাম
হাসান আল জুবায়ের রনি
ড. মোহাম্মদ কামরুল হক ভূঞা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০২২

পুনর্মুদ্রণ: , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

নাসরীন সুলতানা মিতু

চিত্রণ

অধরা পতত্রী

প্রচ্ছদ

অধরা পতত্রী

গ্রাফিক্স ডিজাইন

নাসরীন সুলতানা মিতু

অধরা পতত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে, তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবীজুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায় পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকটির মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

শিখন অভিজ্ঞতা ১ — ডিজিটাল সময়ের তথ্য ১

শিখন অভিজ্ঞতা ২ — বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবহার ২০

শিখন অভিজ্ঞতা ৩ — তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি ৩৮

শিখন অভিজ্ঞতা ৪ — সাইবার গোয়েন্দাগিরি ৫১

শিখন অভিজ্ঞতা ৫ — আমি যদি হই রোবট ৬১

শিখন অভিজ্ঞতা ৬ — বন্ধু নেটওয়ার্কে ভাব বিনিময় ৮৫

শিখন অভিজ্ঞতা ৭ — গ্রাহক সেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ৯৭

শিখন অভিজ্ঞতা ৮ — যোগাযোগে নিয়ম মানি ১১৩

শিখন অভিজ্ঞতা ৯ — আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র ১২৯

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

নতুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে তোমাদের শিক্ষাজীবন শুরু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কাজ করা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষাকে আরো বেশি আনন্দঘন ও ফলপ্রসু করা। এখন তোমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে তোমার বেড়ে উঠার এবং নিজেকে আরো বিকশিত করার সামাজিক কেন্দ্র। তোমরা এখন শুধু এই বই থেকে শিখবে না, বরং এই বই থেকে নির্দেশনা নিয়ে তোমার আশেপাশের পরিবেশ, মানুষ এবং প্রযুক্তি থেকেও শিখবে।

প্রযুক্তির উন্নয়ন আমাদের এমন একটি জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে, প্রতিদিনই নতুন নতুন জ্ঞান যুক্ত হচ্ছে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনও পরিবর্তন হচ্ছে খুব দ্রুত। তাই আজ যেটি আমি মুখস্থ করলাম তা আর কয়েকবছর পর কাজে নাও লাগতে পারে। সুতরাং আমাদের শেখার প্রক্রিয়াও হতে হবে আধুনিক। কোন কিছু দেখে মুখস্থ করে নয় বরং আশেপাশের পরিবেশকে আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে হাতের কাছে যে সব উপকরণ আছে তাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হতে হবে। আর এই বই তারই সুযোগ করে দিয়েছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি এখন আর কম্পিউটার চালানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত সকল ধরনের সমস্যার প্রযুক্তিগত সমাধান ডিজিটাল প্রযুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আমরা শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার করা শিখব তা কিন্তু নয়। প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা সমস্যার সমাধান করব ও সাথে সাথে সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন প্রযুক্তিও আবিষ্কার করতে শিখব। এই বই আমাদের সে আবিষ্কারক হওয়ার পথে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

বইয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, হাতের কাছে যদি কোন প্রযুক্তি নাও থাকে তারপরও তোমরা কীভাবে সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তিগত সুবিধা কাজে লাগাতে পারো তা হাতে কলমে শিখতে পারবে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, তোমরা এখন নিজের বন্ধুদের সাথে বা পাশের বিদ্যালয়ের বন্ধুদের সাথে প্রতিযোগিতা করবে না। তোমরা সহযোগিতার মাধ্যমে সবাই একসাথে বিশ্বনাগরিক হয়ে বড় হবে।

তোমার জন্য শুভকামনা!

শিখন অভিজ্ঞতা ১

ডিজিটাল সময়ের তথ্য

সেশন–১: উপযুক্ত প্রশ্নে যথার্থ সমাধান

আচ্ছা, ছোটদের জীবনে বেশি সমস্যা নাকি বড়দের? আসলে ছোটবড় সবারই প্রতিদিন নানা রকম ঝামেলায় পড়তে হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড়রাই বড় বড় সমস্যাগুলো আমাদের সমাধান করে দেন। কেমন হবে যদি আমরা ছোটরাও বড়দের সমস্যাগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করি? বর্তমান সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে আমরা কিন্তু শুধু তথ্যের মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারি। ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা তথ্য এবং এর উৎস সম্পর্কে জেনেছি। সপ্তম শ্রেণিতে আমরা তথ্য অনুসন্ধান এবং ব্যবহার করে বড়দের একটি সমস্যাকে সমাধান করার চেষ্টা করব।

যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্যার গভীরে গিয়ে বুঝে নিতে হয় সমস্যার পেছনের কারণ। বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি এবং সহজ উপায় হচ্ছে প্রশ্ন করা। আজকে আমরা সঠিক প্রশ্ন করার উপায় খুঁজে বের করব। তার আগে একটি ঘটনা পড়ে নিই।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শিশির তখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। ঈদের ছুটিতে মায়ের সঙ্গে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছে যেখানে সে আগে কখনো যায়নি। যে বাড়িতে সে বেড়াতে গিয়েছে সেখানে তার বয়সি এমন কেউ ছিল না যার সঙ্গে সে খেলতে পারবে, কিন্তু সেই বাড়ির খুব কাছেই আরেকজন আত্মীয়ের বাড়িতে তার বয়সী অনেকে আছে যাদের সঙ্গে খেলতে পারলে খুব মজা হবে। শিশির সেই বাড়িতে একদিন আগেই গিয়েছিল, সে ভাবল একাই মাকে বলে ওই বাড়িতে চলে যাবে। শিশির দুপুরের খাবার খেয়েই সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে হেঁটে রওনা দিলো । সেই বাড়িতে যেতে ১০ মিনিটের বেশি লাগার কথা না, কিন্তু শিশির প্রায় ৩০ মিনিট হেঁটে ফেলল কিন্তু ওই বাড়িটা পেল না। শিশির বুঝতে পারল সে রাস্তা ভুল করে ফেলেছে। সে সেখানে দাঁড়িয়েই কাঁদতে লাগল। শিশিরের কাছে মায়ের ফোন নম্বর, যে বাড়িতে বেড়াতে এসেছে সেই বাড়ির নাম কিছুই মনে ছিল না, তাই কারও সাহায্যও চাইতে পারছিল না। এমন সময় ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এরকম বয়সি একজন ছেলে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে?’ শিশির প্রথমে উত্তর দিতে পারল না, পরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি রাস্তা ভুলে গেছি। ছেলেটি জিজ্ঞেস করল ‘তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?’ ‘যে বাড়িতে যাচ্ছিলে সেটি দেখতে কেমন?’ ‘তুমি কখন রওনা দিয়েছ আর ওই বাড়িতে পৌঁছাতে তোমার কতটুকু সময় লাগার কথা?’ ‘এখানে তোমরা কেন বেড়াতে এসেছ?’ এরকম অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর যা দাঁড়াল, তা হলো ‘শিশির তার মায়ের সাথে একটি বিয়েতে এসেছে, সে বিয়ে বাড়িটি রেললাইনের পাশে। রেললাইনের পাশে বিয়ের গেইট সাজানো আছে, আত্মীয়ের বিয়ে বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব ১০ মিনিট। শিশিরের সব উত্তর শুনে ছেলেটি বিয়ে বাড়িটি চিনে ফেলল আর শিশিরকে পৌঁছে দিলো।

শিশিরের এই ঘটনায় আমরা বুঝতে পারলাম, সঠিক প্রশ্ন করতে পারা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক প্রশ্ন করতে পারার সহজ উপায় হচ্ছে, ৬ক মেনে প্রশ্ন করা।

৬ক হলো—

কে?	কী?	কোথায়?
কখন?	কেন?	কীভাবে?

এই ৬টি ‘ক’ মাথায় রেখে যদি আমরা তথ্য অনুসন্ধান করি কিংবা কোনো তথ্য উপস্থাপন করার সময় যদি আমরা এই ৬টি ‘ক’ বিবেচনা করি তাহলে আমরা সম্পূর্ণ তথ্য খুঁজে পাব বা পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপস্থাপন করতে পারব।

এবার আমাদের কাজ শুরু করার পালা। আমরা শ্রেণিকক্ষের সব বন্ধু, শিক্ষকের সহায়তায় তিনটি দলে ভাগ হয়ে তিন রকমের লক্ষ্যদল নিয়ে কাজ করব। লক্ষ্যদল বা টার্গেট গ্রুপ কী তা ইতোমধ্যে আমরা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে জানতে পেরেছি।

আমাদের তিনটি লক্ষ্যদল হতে পারে –

১। বাবা মা বা তাদের বয়সি অভিভাবক

২। দাদা-দাদি, নানা-নানি বা তাদের বয়সি কোনো আত্মীয় বা প্রতিবেশী

৩। শিক্ষক

আমাদের কাজ হবে আমাদের লক্ষ্যদল গত একমাসে কী কী ধরনের সমস্যায় পড়েছেন তা খুঁজে বের করা এবং তথ্য অনুসন্ধান করে সমস্যার সমাধান চিহ্নিত করা। সমাধান চিহ্নিত হয়ে গেলে সমাধানটি তাদের কাছে সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে তাদের সাহায্য করা।

আমাদের লক্ষ্যদলের সমস্যাগুলো হতে পারে খুব ছোট ছোট কিন্তু সমাধান করা গেলে তাদের অনেক বেশি উপকার হবে। যেমন সমস্যা হতে পারে–

- দাদির ওষুধ খেতে মনে না থাকতে পারে।
- কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে গেলে বাবার প্রিয় গাছটি পানি না পেয়ে শুকিয়ে যেতে পারে।
- দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থেকে ক্লাস নিতে হয় বলে শিক্ষকের পায়ে ব্যথা হতে পারে।

উপরের উদাহরণগুলো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দেওয়া হলো। এবার আমরা আমাদের জন্য শিক্ষক যে লক্ষ্যদল ঠিক করে দিয়েছেন সে লক্ষ্যদলের কী কী দৈনন্দিন সমস্যা আছে তা তাদেরকে প্রশ্ন করে খুঁজে বের করব।

বাড়ির কাজ:

৬টি ‘ক’ দিয়ে প্রশ্ন করার কৌশল কাজে লাগিয়ে সবাই বাড়িতে গিয়ে যার যার লক্ষ্যদলকে প্রশ্ন করে তাদের সমস্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। এখানে লক্ষ্য রাখব, তারা প্রথমেই সমস্যার কথা হয়তো বলতে পারবেন না বা অনেক বড় সমস্যার কথা বলবেন। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করে করে তাদের সমস্যার পেছনের খুঁজে বের করব।

আমাদের দলের লক্ষ্যদল বা টার্গেট গ্রুপ
প্রাপ্ত সমস্যা

সেশন–২: সমস্যার শ্রেণিকরণ

আমরা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারব পৃথিবীর সব আবিষ্কারের শুরু কিন্তু সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে। মানুষ বিভিন্ন রকম সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে আর সেটির সমাধান করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন কিছু। তাই নতুন কিছু তৈরি করার প্রথম ধাপই হচ্ছে সমস্যা চিহ্নিত করতে পারা।

আজকে আমরা বাড়ি থেকে করে আনা আমাদের সমস্যাগুলো একসঙ্গে করব, তারপর সিদ্ধান্ত নিব যে, কোন সমস্যাটি নিয়ে আমরা কাজ শুরু করতে পারি। সমস্যাগুলো একসঙ্গে করার জন্য আমরা আজকে কাজ করব ওয়ার্ড প্রসেসিং এর মাধ্যমে।

বর্ণমালা, শব্দ, চিহ্ন, ছবি ইত্যাদির সমন্বয়ে কম্পিউটার বা মোবাইল ব্যবহার করে কোনো ডকুমেন্ট (দলিল) তৈরি করার প্রক্রিয়া হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসিং। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, নোটপ্যাড, ল্যাটেক্স ইত্যাদি বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে ওয়ার্ড প্রসেসিং করা যায়। আজকে শিক্ষক আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমাদের সমস্যাগুলো একসঙ্গে করে একটি তৈরি ডকুমেন্ট তৈরি করা শেখাবেন।

শিক্ষক আমাদের সাহায্য করবেন, কিন্তু আমরা নিজেরা চেষ্টা করে দেখতে পারি–ধাপে ধাপে নির্দেশনা মেনে একটি ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারি কিনা–

১। কম্পিউটার চালু হওয়ার পর, মাউসটি নিয়ে মাউসের ডান পাশে ক্লিক করি। একটি বক্স আসবে সেখানে একটি লিখা আসবে ‘new’

২। ‘New’তে কার্সর নিয়ে আসলে নতুন আরেকটি বক্স আসবে। এখানে কম্পিউটারে যে যে প্রোগ্রাম সফটওয়্যার আছে সবগুলোর নাম আসবে। এখান থেকে আমরা ‘Microsoft Word Document’-এ ক্লিক করব।

৩। কম্পিউটারে ‘Microsoft Word Document’ নামে একটি ফাইল তৈরি হয়ে যাবে। একই কাজ ‘Start’ মেন্যুবার থেকেও করা যায়।

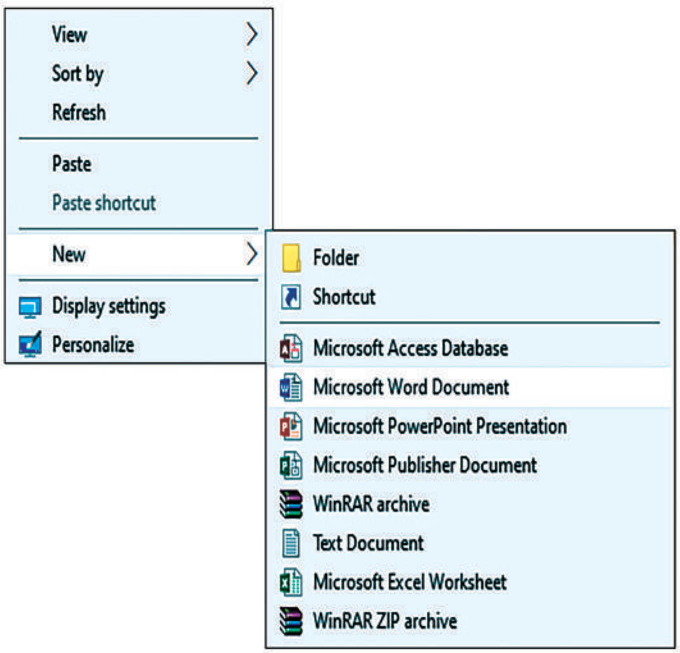

৪। সে ফাইলের উপর মাউস নিয়ে গিয়ে আবার মাউসের রাইট ক্লিক বা ডান পাশে ক্লিক করি, আবার নতুন একটি বক্স আসবে। সেখানে অনেকগুলো লিখার মধ্যে একটি লিখা থাকবে 'Rename'. 'Rename' এর উপর ক্লিক করলে আমার তৈরি হওয়া ফাইলটির নামের উপর কার্সর চলে যাবে। এখানে আমরা ইচ্ছামতো নিজেদের ডকুমেন্ট-এর নাম দিতে পারব। কী-বোর্ডে যে অক্ষরগুলো আছে সেগুলো টাইপ করে করে আমরা নাম দিতে পারব।

৫। আমাদের একটি ডকুমেন্ট ফাইল তৈরি হলো।

এবার আমরা আমাদের লক্ষ্যদলকে প্রশ্ন করে নিয়ে আসা চিহ্নিত সমস্যাগুলো ফাইলে লিখব। একটি দল থেকে যতগুলো সমস্যা এসেছে, সবগুলো আমাদের ফাইলে লিখে রাখতে হবে।

আমাদের কম্পিউটারে হয়তো ইংরেজি 'কী-বোর্ড' অ্যাকটিভ (চালু) আছে, আমরা যেহেতু বাংলায় লিখব তাই বাংলা কী-বোর্ড অ্যাকটিভ করতে হবে।

বাংলা কী-বোর্ড অ্যাকটিভ করতে হলে একসঙ্গে তিনটি কী চাপতে হবে– Ctrl-Alt-B

প্রথমে আমাদের লেখার একটি শিরোনাম দেওয়ার প্রয়োজন, তাই না? শিরোনামের লেখার আকার অন্য লেখা থেকে একটু বড় হওয়া চাই, তাহলে এই কাজটি করে নিই।

শিরোনামটি লিখে আমরা মাউসের বাম পাশ চেপে ধরে পুরোটা অংশ সিলেক্ট করে নিব। তারপর মেনুবারে বামপাশে (নিচের ছবির মতো) ফন্টের আকার প্রয়োজনমতো বাড়িয়ে নিব।

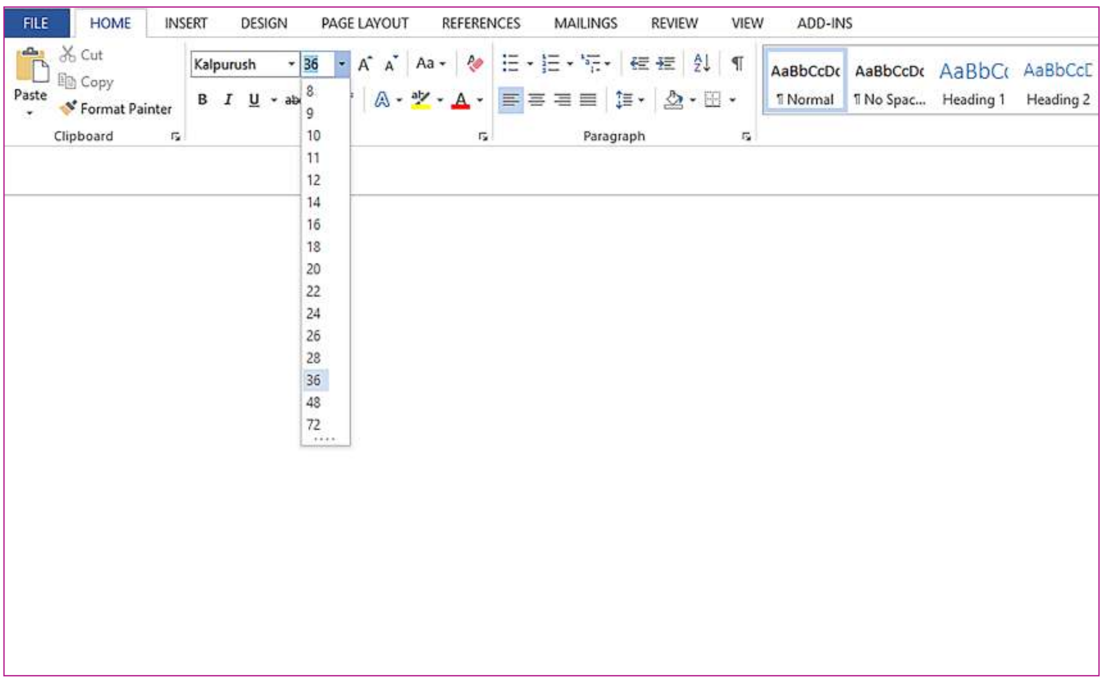

শিরোনাম লেখা হয়ে গেলে নিচে ১, ২, ৩ নম্বর দিয়ে নিজেদের সমস্যাগুলো এক এক করে লিখে ফেলব।

সেশন–৩: ‘শর্টকার্ট-কী’

কম্পিউটার ব্যবহার করে কোন একটি কাজ করতে পারা বেশ মজার, তাই না? আমাদের সমস্যাগুলো একসঙ্গে করার কাজটি আমরা খাতায় কিংবা বোর্ডে লিখেও করতে পারতাম কিন্তু এই সুযোগে আমাদের কম্পিউটারে কাজ করা শিখা হয়ে গেল। আমাদের ভবিষ্যতের সব কাজ কিন্তু কম্পিউটার ব্যবহার করেই করতে হবে, তাই এখন থেকেই একটু একটু শেখা হলে মন্দ হয় না।

আজকেও আমরা ওয়ার্ড প্রসেসিং-এ কাজ করব। কিন্তু আজকের কাজটি একটি খেলার মতো হবে।

নিচে কিছু ইনস্ট্রাকশন বা নির্দেশনা দেওয়া আছে, কম্পিউটারে একটি ফাইল তৈরি করে এই নির্দেশনা অনুসরণ করলে আমাদের ওয়ার্ড ফাইলে কী পরিবর্তন হবে তা আমরা লিখব। শ্রেণিকক্ষের সব শিক্ষার্থী যেন এই খেলাটিতে অংশগ্রহণ করতে পারে তা লক্ষ রাখব।

কম্পিউটারের কী-বোর্ডে এই ‘কী’ গুলো চাপব	বামপাশের ঘরের ‘কী’ গুলো চাপলে কী ঘটে তা নিচের যে ঘরগুলোতে লেখা নেই সে ঘরগুলোতে লিখব
Ctrl + A	ডকুমেন্ট এর পুরো অংশ ‘সিলেক্ট’ হয়ে গেছে
একটি নির্দিষ্ট লিখা সিলেক্ট করে Ctrl + C	সিলেক্ট করা অংশ কপি হয়ে গেছে
Ctrl + V	
Ctrl + B	
Ctrl + X	
Ctrl + Z	
Enter	
Backspace	
Ctrl + F	একটি ‘নেভিগেশন’ বার আসবে সেখানে আমরা ডকুমেন্ট-এর একটি শব্দ খুঁজতে চাই তা লিখেছি এবং Enter চেপেছি। পুরো ডকুমেন্টে ঐ শব্দ কোথায় কোথায় আছে তা বের হয়ে গিয়েছে।

আমরা কম্পিউটারের এই খেলার মাধ্যমে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর অনেক ‘শর্টকাট-কী’ শিখে গিয়েছি। মজার ব্যাপার হলো, এই শর্টকার্টগুলো শুধু মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর কাজেই লাগবে না, অন্যান্য অনেক অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করার সময়ও এসব ‘শর্টকার্ট-কী’ কাজে লাগবে।

এবার আমরা আমাদের লক্ষ্যদল বা টার্গেট গ্রুপের সমস্যা সমাধানের কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাব। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিব আমার টার্গেট গ্রুপের কোন সমস্যাটি সমাধান করতে চাই। এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে, আমরা কিন্তু আলাদা আলাদা সমস্যা নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু কিছু কিছু সমস্যা আছে যেগুলো আমাদের লক্ষ্যদলের সবাই কম বেশি সম্মুখীন হয় তাই আমরা এমন সমস্যাটি বেছে নিব যা অনেকের উপকার আসবে। দলগত আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিব কোন সমস্যাটি আমরা বাছাই করব–

আমাদের লক্ষ্যদল	
আমরা যে সমস্যাটি নিয়ে কাজ করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।	
আমরা যে কারণে সমস্যাটি চিহ্নিত করেছি। (এই অংশটুকু বাড়ির কাজ)	
আমাদের সমস্যাটি সমাধানের তথ্য যে উৎসে পাওয়া যেতে পারে। (এই অংশটুকু বাড়ির কাজ)	

সেশন–৪: তথ্য অনুসন্ধান

সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কোনো সমস্যা খুঁজে বের করা এবং এর পেছনের কারণ কী তা খুঁজে বের করা। আমরা এই দুইটি কাজই ইতোমধ্যে করে ফেলেছি। এবার আমরা তথ্য অনুসন্ধান করে সমস্যাটির সমাধান খুঁজে বের করব।

চলো আমরা আরেকটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করি–

সমস্যার উদাহরণ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি সেশন শেষ করতে পারছেন না।

আমাদের যে সমাধান খুঁজতে হবে : শ্রেণিকক্ষে কীভাবে ব্যবস্থাপনা করলে শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ে সকল শিক্ষার্থীর একটি সেশনের সব কাজ শেষ করতে পারবেন?

সমাধানের তথ্যের উৎস হতে পারে : পত্রিকা, অন্য কোনো শিক্ষক, এই বিষয়ের কোনো বই, ইন্টারনেট।

আমরা বাড়িতে গিয়ে আমাদের সমস্যার সমাধানের জন্য তথ্য খুঁজে বের করব। আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারি, কোনো পত্রিকায় আমাদের সমস্যা বিষয়ে লেখা আছে কি না খুঁজে দেখতে পারি অথবা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার নিতে পারি।

তথ্য অনুসন্ধানের কাজটি আমরা বাড়িতে করব, কিন্তু তার আগে তথ্য অনুসন্ধান সম্পর্কিত কিছু সাধারণ বিষয় জেনে রাখা ভালো।

মানবীয় উৎস থেকে তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে–

১। আমরা যখন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য নিব তখন লক্ষ রাখব, ঐ ব্যক্তি তথ্যটির সাথে সম্পর্কিত কি না। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি তথ্যটির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ কি না। যেমন–একজন ব্যক্তি যিনি কখনো কম্পিউটার ব্যবহার করেননি তাকে আমরা জিজ্ঞেস করি না যে কম্পিউটারে কোন এন্টিভাইরাস ব্যবহার করা উচিৎ।

তেমন একজন ডাক্তারের কাছে আমরা জানতে চাইবো না ....

২। কোন ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য নেওয়ার সময় তার মতামতের চেয়ে প্রকৃত সত্য বা ফ্যাক্টকে গুরুত্ব দিব। মতামত হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা ভাবনা যা অনুভূতির প্রকাশ আর অন্যদিকে ফ্যাক্ট হচ্ছে প্রমাণযোগ্য তথ্য। যেমন–মতামত হচ্ছে ‘আজকে অনেক গরম পড়ছে’ আর ফ্যাক্ট হচ্ছে ‘আজকের দিনের তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস।’

মতামত হচ্ছে ‘ শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে’, আর ফ্যাক্ট হচ্ছে ....

৩। ব্যক্তি যে উৎসের উপর ভিত্তি করে তথ্য দিচ্ছে সেই উৎসটি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য কি না, সেটিও দেখা জরুরি। যেমন–কোনো ব্যক্তি এসে বললেন, বাজারে গিয়ে শুনলাম ‘ক’ দেশে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। এখানে উৎস হচ্ছে ‘বাজার’ যেটি কোন সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য উৎস নয়। এখানে নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পারে, আজ ২০ তারিখ ‘খ’ টেলিভিশনের ৮টার সংবাদে একটি প্রতিবেদনে দেখালো ‘ক’ দেশে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে।

অনির্ভরযোগ্য উৎস হলো, গতকাল ইন্টারনেটে দেখলাম ‘ক’ ব্যক্তি বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন, নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে ....

৪। যখন কোনো ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট কোনো উৎসের উপর ভিত্তি করে তথ্য দেয় তখন উৎসটি সত্যিই ঐ তথ্য দিয়েছে কি না তা আমরা যাচাই করতে পারি। আর সুনির্দিষ্ট উৎস উল্লেখ না করলে যাচাই করা সম্ভব হয় না। যেমন–একজন ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে একটি শিশুর ছবি পাঠিয়ে বিভিন্নজনকে বললেন,'শিশুটিকে চৌরাস্তার মোড়ে পাওয়া গেছে, তার বাবা-মাকে খুঁজে পেতে বেশি বেশি পোস্টটি/ছবিটি শেয়ার করুন।' শিশুটির ছবিতে আর কোনো লেখা বা তথ্য উল্লেখ নেই।

আর কী কী তথ্য থাকলে আমরা শিশুটির এই ঘটনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারতাম? ....

৫। প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি, সময়, স্থান ইত্যাদির ভিন্নতার উপর কোন তথ্য ভিন্ন বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে পারে। তাই কোন তথ্য নেওয়ার সময় একজন ব্যক্তি কোন প্রসঙ্গে কখন তথ্যটি দিচ্ছে সেটি বুঝে তথ্যটি নিতে হবে বা ব্যবহার করতে হবে। যেমন- তুমি ইন্টারনেট সার্চ করে ২০১৪ সালের একটি সংবাদ থেকে জানতে পারলে বাংলাদেশে দশটি শিক্ষা বোর্ড, কিন্তু বর্তমানে সঠিক তথ্য হচ্ছে বাংলাদেশে এগারটি শিক্ষা বোর্ড। তোমার তথ্যটি কি ভুল? হ্যাঁ, তোমার তথ্যটি বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে ভুল। তোমার তথ্যটি ছিল ২০১৪ সালের, বর্তমান তথ্যটি ২০২৩ সালের।

এই ধরনের আরও একটি উদাহরণ দিই: ....

....

বাড়ির কাজ :

উপরের বিষয়গুলো লক্ষ রেখে আমরা বাড়িতে যার যার দলগত চিহ্নিত সমস্যাটির সমাধান খুঁজতে তথ্য অনুসন্ধান করব। নিচের ঘরে লিখব আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কী কী তথ্য পেয়েছি।

আমাদের সমস্যা :
সমাধানের জন্য যে তথ্য খুঁজে পেলাম :

সেশন–৫: তথ্য যাচাই

তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের ফলে আমাদের কাছে প্রতিনিয়ত অনেক তথ্য আসে। অনেক সময় একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন তথ্য থাকতে পারে। তাই কোন তথ্যটি সবচেয়ে বেশি সাম্প্রতিক এবং যথার্থ তা যাচাই করা জরুরি। এখন আমরা নিচের তথ্য যাচাই করার উপায়গুলো বিবেচনা করে শ্রেণিকক্ষে বসেই আমাদের বাড়ির কাজ হিসেবে করে নিয়ে আসা তথ্যগুলো শিক্ষকের সহায়তায় যাচাই করব।

১। তথ্যটি কত তারিখে প্রচারিত হয়েছে। (কারণ সময়ের ব্যবধানে আজকের আপাত দৃষ্টিতে কোনো সঠিক তথ্য আগামীকাল ভুল প্রমাণ হয়ে যেতে পারে। যেমন: দেশের মোট বিভাগ ৭টি এটি ২০১৪ সাল পর্যন্ত সঠিক তথ্য হলেও ২০১৫ সালের জন্য এটি সঠিক তথ্য নয় কারণ ২০১৫ সালে ময়মনসিংহকে নতুনভাবে বিভাগ ঘোষণা করা হয়)।

২। যতটা সম্ভব সাম্প্রতিক তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করব।

৩। কোনো নিউজের হেডলাইন বা শিরোনাম দেখেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিব না, পুরো খবর পড়ব।

৪। কোন মাধ্যমে একটি সংবাদ দেখার পর একই Key Word দিয়ে আবার সার্চ দিব এবং যাচাই করব, অন্য মাধ্যমও একই সংবাদ দিচ্ছে কি না (ইন্টারনেট-এর সুবিধা থাকলে)।

৫। পত্রিকা বা টেলিভিশনের লোগো দেখেই বিশ্বাস করে ফেলব না যে, সংবাদটি ঐ পত্রিকার বা টেলিভিশনের। যাচাই করার জন্য ঐ পত্রিকা বা টেলিভিশনের ওয়েবসাইটে যাব।

৬। আমি যে প্রতিষ্ঠানের তথ্য নিতে চাই সেই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে যাব। লক্ষ রাখব হাইপারলিংকটি ঠিক আছে কি না। যেমন–বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর কোনো তথ্য বা নোট চাইলে হাইপারলিংকটি হবে এরকম–http://www.nctb.gov.bd অনেক সময় কেউ যদি পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর নামে কোনো ভুল তথ্য প্রচারণা করতে চায়, তাহলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর ওয়েবসাইটের মত নকল একটি ওয়েবসাইট তারা বানিয়ে রাখতে পারে, সেক্ষেত্রে হাইপারলিংকটি দেখতে ভিন্ন রকম হতে পারে। সেই লিংকে কোনো একটি দুইটি অক্ষর এলোমেলো থাকবে, যেমন–c এর জায়গায় n, b এর জায়গায় d, o-এর জায়গায় i, এরকম এলোমেলো করে অক্ষরগুলো থাকবে, যা হয়তো আমাদের সহজে চোখে পড়বে না। তাই তথ্য নেওয়ার আগে লিংকটি ঠিক আছে কি না তা দেখে নেওয়াটা জরুরি।

আজকের সেশনে তথ্য যাচাই করার সময় নতুন কী জানলাম তা লিখব :

সেশন–৬: তথ্য উপস্থাপনে কনটেন্ট তৈরি

আমরা আমাদের লক্ষ্যদলের একটি সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার জন্য তথ্য অনুসন্ধান ও যাচাই করে একটি সমাধান খুঁজে বের করেছি। কিন্তু এই সমাধানটি তাদের কীভাবে জানাব? আমরা বাড়িতে গিয়ে তাদের জানিয়ে দিলে তারা জেনে যাবেন কিন্তু তাদের কাছে যদি সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারি তবে সে সমাধানটি সত্যিই তাদের কাজে লাগবে।

আমরা আগেই ঠিক করেছিলাম, আমাদের সমাধানটি জানানোর জন্য আমরা কনটেন্ট তৈরি করব। আমরা কি জানি, কনটেন্ট কী?

শৈবাল আজকে বিদ্যালয় আসার সময় দেখল অনেক মেঘ করেছে, ও ক্লাসে এসে তার বন্ধুদের বলল ‘জানিস আজকে বৃষ্টি হবে।’ শৈবাল তার বন্ধুদের তার চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে একটি তথ্য দিলো, এটি হচ্ছে তার মতামত। একই তথ্য যদি শৈবাল একটি মেঘের ছবি তুলে, সেখানে তার নাম লিখে বৃষ্টির পূর্বাভাস লিখে কোনো একটি মাধ্যমে প্রচার করে তার বন্ধুদের জানাত তাহলে আমরা সেই তথ্যটিকে বলতে পারতাম শৈবালের তৈরি করা ‘বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট’।

মালা গতকাল মায়ের সঙ্গে বাজারে গিয়েছিল। একটি দোকান থেকে কলম কিনতে গেলে দোকানি তাকে বললেন, ‘দুইটি কলম কিনলে একটি কলম ফ্রি।’ মালা খুব খুশি হলো। মালা দোকানির কাছ থেকে তথ্যটি জানল। মালা যদি বাজারে একটি পোস্টারে ওই দোকানের বিজ্ঞাপন দেখত, ‘দুইটি কলম কিনলে একটি কলম ফ্রি’ তাহলে ওই পোস্টারের বিজ্ঞাপনটিকে বলা যেত একটি ‘বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট’।

কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু হলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিভিন্নরকম তথ্যের সংকলন (সংযোগ বা একত্রিত করা) যা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে পাঠক বা দর্শকের বোঝার উপযোগী করে তৈরি করা হয়। বইয়ের গল্প, নাটক, সিনেমা, খবর, গান এগুলোই হচ্ছে কনটেন্ট। কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু শুধু যে আমাদের তথ্য দেয় তা কিন্তু না, এটি আমাদের বিনোদনও দেয়।

আমরা আমাদের লক্ষ্যদলকে আমাদের সমাধানটি জানানোর জন্য একটি কনটেন্ট তৈরি করব। কিন্তু আমাদের টার্গেট গ্রুপ বা লক্ষ্যদল ভিন্ন ভিন্ন। তিনটি দলের টার্গেট গ্রুপ আলাদা, তাই তাদের কনটেন্ট-এর পছন্দের বিষয়ও হতে পারে আলাদা আলাদা। তাই চলো আমরা নিজেরাই একটু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যদলের কনটেন্ট পছন্দের ভিন্নতা কেমন হতে পারে–

নিচের ঘরে আমরা ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যদলের পছন্দের কনটেন্ট কী হতে পারে তা অনুমান করে লিখি–

লক্ষ্যদল	পছন্দের কনটেন্ট হতে পারে
শিশু, যে পড়তে পারে না	ছড়া, গান, কার্টুন ইত্যাদি
শিশু, যে পড়তে শিখেছে	কার্টুন, গল্পের বই, গেইমস ইত্যাদি
কিশোর/কিশোরী	
মধ্যবয়সি নারী	
মধ্যবয়সি পুরুষ	
রিকশাচালক	
মুদি দোকানি	
বৃদ্ধ, যিনি চোখে দেখতে পারেন না	

এবার আমাদের লক্ষ্যদলের জন্য কনটেন্ট নির্ধারণ করতে হবে। আমরা দলে আলোচনা করে ঠিক করব আমাদের সমস্যার সমাধানের ধরন এবং আমাদের লক্ষ্যদলের ভিন্নতার উপর নির্ভর করে কনটেন্টটি কী হতে পারে।

নিচে কিছু কনটেন্ট-এর উদাহরণ দেওয়া হলো–

১। ছবির পর ছবি সাজিয়ে গল্প তৈরি

২। ছড়াগান

৩। ডিজিটাল পোস্টার

৪। ভিডিও

৫। প্রেজেন্টেশন

৬। মোবাইল ফোনে নাটক তৈরি

৭। কমিকস

সেশন–৭: 'উপস্থাপন সফটওয়্যার' শিখে কনটেন্ট তৈরি

আমরা আমাদের লক্ষ্যদল থেকে প্রাপ্ত সমস্যাগুলোর সমাধান শ্রেণিবিন্যাস করতে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রসেসিং অনেকখানি শিখেছি। মজার ব্যাপার হলো, ছোটবেলায় আমরা যখন নামতা শিখেছিলাম আমাদের একটু সময় লেগেছিল কিন্তু এখন একটু ভাবলে বুঝতে পারি এই নামতাগুলো শুধু গাণিতিক কাজ করার জন্যই না বরং প্রতিদিনের জীবনে হিসেব নিকেশ করতেও কাজে লাগছে। ওয়ার্ড প্রসেসিংও ঠিক একই রকম, এটি শিখে গেলে অন্য সফটওয়্যার আমরা সহজে আয়ত্ত করতে পারব।

আজকে আমরা কম্পিউটারের আরও একটি সফটওয়্যারের সাথে পরিচিত হব। সেটি হলো, 'মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট'। এটি অনেক বেশি ব্যবহৃত একটি উপস্থাপনা সফটওয়্যার। এছাড়া উপস্থাপনার জন্য প্রেজি, ক্যানভা, গুগল স্লাইড এরকম আরও অনেক সফটওয়্যার আছে। তবে 'মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট' যেহেতু বেশ সহজ, তাই আমরা সবার আগে এটি শিখে নিব, এটি জানা থাকলে অন্যান্যগুলো শেখা অনেক সহজ হবে।

১। ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর মতোই, প্রথমে মাউসের ডান পাশে ক্লিক (রাইট ক্লিক) করে 'New'তে ক্লিক করলে অনেকগুলো সফটওয়্যারের নাম আসবে, আমরা 'Microsoft PowerPoint Presentation' সিলেক্ট করব। এবার একটি ফাইল তৈরি হয়ে যাবে। পূর্বের মতোই 'Rename' করে আমাদের পছন্দমতো নাম দিব। ফাইলটির উপর ডাবল ক্লিক করে ফাইলটি খুলব।

২। পাওয়ার পয়েন্টে অনেক অনেক ফিচার রয়েছে যা আমরা নিজে নিজে প্রয়োগ (অ্যাপ্লাই) করলে খুব মজা করে শিখতে পারব। তবে শুরুটা করতে হবে বাম পাশের 'New Slide' থেকে। এখানে ক্লিক করলে একটি নতুন পৃষ্ঠা আমাদের উপস্থাপনা ফাইলে যোগ হওয়ার জন্য অনেকগুলো অপশন আসবে। আমরা পছন্দমতো একটি স্লাইড সিলেক্ট করব যেখানে আমরা আমাদের পরবর্তী কাজগুলো করব।

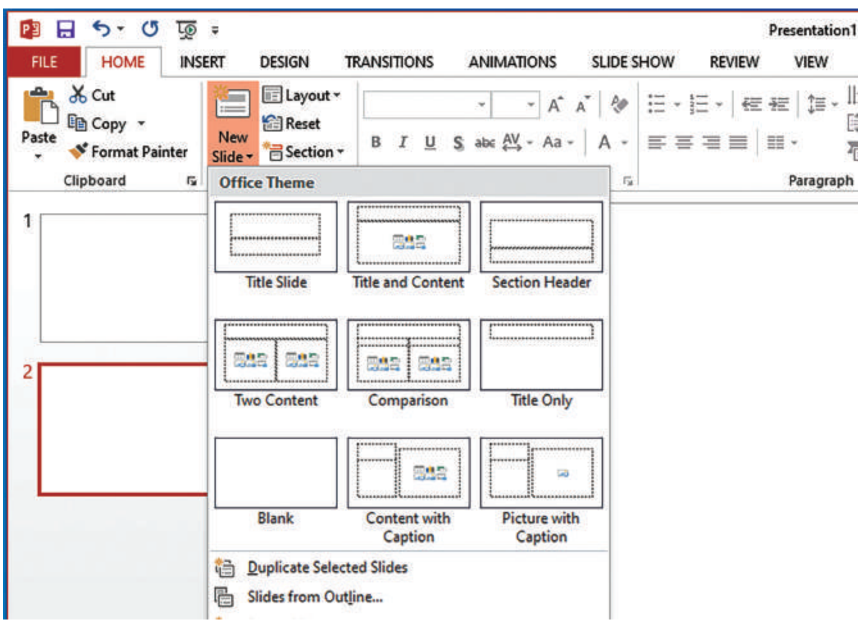

মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট-এর কাজগুলো ধাপে ধাপে বর্ণনা করা জানতে গেলে আমাদের কাজ করতে একটু সময় লেগে যাবে, তার চেয়ে বরং মেন্যুবারের কিছু টুলস-এর কাজ কী তা জেনে নিয়ে নিজেরাই চেষ্টা করি একটি প্রেজেন্টেশন বানানোর।

- 'Home' মেন্যুবারে কোনো লেখাকে ছোট-বড়, লেখার ফন্ট পরিবর্তন, রং পরিবর্তন, কোনো পরিচ্ছেদকে সমান করা, পৃষ্ঠায় কোনো লেখার অবস্থান ঠিক করা, এই কাজগুলো করা যায়।
- 'Insert' মেন্যুবারে ছবি, ছক, বক্স, আইকন ইত্যাদি বসানো যায়। সর্বডানের 'Media' মেন্যু থেকে আমরা ভিডিও এবং অডিও যুক্ত করতে পারি। এক্ষেত্রে আমার কম্পিউটারে এই ছবি, ভিডিও বা অডিও আগে থেকে সেইভ বা জমা রাখতে হবে। কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে 'Insert' মেন্যুবার সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে।
- 'Design' মেন্যুবার থেকে আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনের ডিজাইন বাছাই করতে পারব।
- 'Transitions' মেন্যুবার থেকে আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনের একটির পর একটি পৃষ্ঠা কীভাবে আসবে তা বাছাই করতে পারি।
- 'Animations' মেন্যুবারটি সবচেয়ে মজার। যে কোনো লেখা, ছবি, আকৃতি (শেইপ) ইত্যাদি যুক্ত করার পর এগুলোকে বিভিন্ন ডিজাইনে চলনশীল করা সম্ভব। 'Add Animation' টুলস-এ ক্লিক করে এটি তিনভাবে ব্যবহার করা যায়।
    - ছবি, লেখা বা আকৃতিটি কীভাবে আসবে
    - ছবি, লেখা বা আকৃতিটি স্লাইড বা পৃষ্ঠায় কীভাবে থাকবে
    - ছবি, লেখা বা আকৃতিটি স্লাইড বা পৃষ্ঠা থেকে কীভাবে চলে যাবে

উল্লিখিত নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে আমরা বিদ্যালয়ের কম্পিউটার বা সম্ভব হলে বাসার কম্পিউটারে এই কাজগুলো করব। আগামী সেশনে আমরা নিজেদের দলের কনটেন্টটি শ্রেণিতে বসেই শেষ করব।

সেশন–৮: একটি সফটওয়্যার থেকে বিভিন্ন রূপে উপস্থাপন

আমরা দলগতভাবে একটি লক্ষ্যদল বা টার্গেট গ্রুপ ঠিক করে তাদের একটি সমস্যা নির্ধারণ করেছি আর সেই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা করেছি। আজকের সেশনে আমরা অবশেষে একটি কনটেন্ট তৈরি করতে যাচ্ছি।

আমরা শ্রেণিতে বসেই কনটেন্ট তৈরির কাজটি করব। আজকে আমরা নতুন কোনো নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা না করে সরাসরি কাজে চলে যাব। কাজটি শেষ হওয়ার পর আমরা এটিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংরক্ষণ করব।

সর্ববামের 'File'-এর 'Save As'-এ ক্লিক করলে আমরা কোন ফরম্যাটে আমাদের ডকুমেন্টটি সংরক্ষণ বা সেইভ করতে চাই তা চিহ্নিত করতে পারব।

- আমরা যদি একটি ডিজিটাল পোস্টার তৈরি করতে চাই তাহলে 'JPG বা JPEG' ফরম্যাট-এ সেইভ করব।

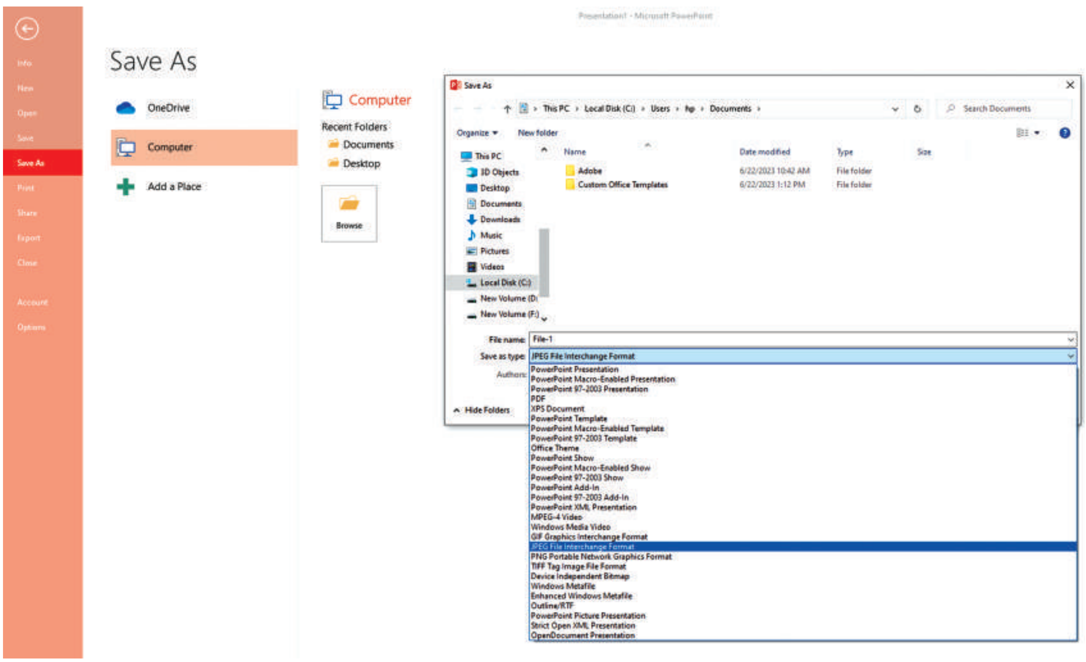

- আমরা যদি আমাদের প্রেজেন্টেশনটা একটি ভিডিও আকারে প্রচার করতে চাই তাহলে 'MP4' ফরম্যাটে প্রেজেন্টেশনটি সেইভ করব।
- আর যেমন করে প্রেজেন্টেশন বানালাম তেমনি যদি প্রেজেন্টেশন বা উপস্থাপন করতে চাই তাহলে 'Microsoft PowePoint Presentation'-এ সেইভ করব।

পুরো অভিজ্ঞতা জুড়ে আমরা দলীয়ভাবে কাজ করেছি। কাজ শেষ করে আমরা দলের সবাইকে মূল্যায়ন করব।

সহপাঠী মূল্যায়ন :

দলের বন্ধু সদস্যের নাম	দলে কাজ করার ক্ষেত্রে বন্ধু সদস্যের যে ভূমিকা আমার ভালো লেগেছে

আমাদের উপস্থাপনা শেষ হলে শিক্ষকের সহায়তায় আমরা আমাদের লক্ষ্যদলের সামনে কনটেন্টটি উপস্থাপন করব (বিদ্যালয়ে, বাড়িতে বা আত্মীয়ের বাড়িতে) এবং তাদের মতামত নিব এবং নিচের তারকা ভরাট করতে বলব। তারকার নিচে লক্ষ্যদল একটি স্বাক্ষরও দিতে পারেন।

লক্ষ্যদলের মতামত :

শিখন অভিজ্ঞতা ২

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবহার

ইতোপূর্বে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ও স্বত্বাধিকারীর অধিকার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। কিন্তু যখন ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে অন্য কাউকে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ আমরা ব্যবহার করতে দেব, আমাদের কিছু নীতিমালা তৈরি করে নেওয়া উচিত। এর ফলে কেউ আমাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ অপব্যবহার করতে পারবে না।

তুমি কি 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র নাম শুনেছ? এটি একটি সংকলনগ্রন্থ, যাতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের পালাগান লিপিবদ্ধ করা আছে। এই পালাগানগুলো প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছিল ময়মনসিংহ অঞ্চলে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ প্রথমে চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করা শুরু করেন। এরপর ড. দীনেশ চন্দ্র সেন সবগুলো পালাগান একত্র করে সম্পাদনা করেন ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। যদি এই কাজ না করা হতো তাহলে আজ হয়তো আমরা এই অসাধারণ সংকলন পেতাম না।

কেমন হয় যদি আমরা নিজেরাই আমাদের এলাকায় কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে যথাযথভাবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে পারি? এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা সেটা করার চেষ্টা করব।

সেশন–১: ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার

হাসির বাবা আফজাল হোসেনের একটি দই তৈরির কারখানা আছে। এই কারখানায় তৈরি দই বাজারে 'হাসি দই' নামে বিক্রি হয়। আজ হাসি এই দই কিনে হঠাৎ অবাক হয়ে আবিষ্কার করে দইয়ের স্বাদ অন্যরকম লাগছে। ভালো করে প্যাকেট লক্ষ করে দেখল সেখানে 'হাসি দই'-এর পরিবর্তে 'হাস দই' লেখা। অথচ প্যাকেট দেখতে একই রকম, একই রং, একই সাইজ, লেখার ফন্টও একই রকম, সবকিছুই মিল আছে, শুধু 'হাসি'র জায়গায় 'হাস' লেখা।

সেটা খুব ভালো করে খেয়াল না করলে হঠাৎ বোঝার উপায় নেই যে, এটা যে হাসি দই না! হাসি খুব চিন্তিত হয়ে বাবার কাছে গিয়ে প্যাকেট দেখিয়ে পুরো ঘটনা খুলে বলল। আফজাল হোসেন সবকিছু শুনে বললেন, হাসি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এই ব্যাপারটি লক্ষ করার জন্য। তবে আমাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমাদের হাসি দইয়ের স্বাদ অন্য দইয়ের তুলনায় আলাদা, তার কারণ এই দই তৈরির প্রণালি আমার উদ্ভাবন করা এবং সেটি বেশ আলাদা অন্যগুলোর তুলনায়।

এ কারণে এই দই তৈরির প্রণালি বা ফর্মুলা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। যারা আমাদের কোম্পানির দই নকল করে প্রায় হুবহু একই নামে বাজারে ছেড়েছে, আমি দ্রুত আমার একজন উকিল বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

যেহেতু আমাদের ট্রেডমার্ক করা আছে, তাই যারা আমাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নকল করে বাণিজ্যিকভাবে ছেড়েছে, তাদের অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ও বাণিজ্যিকভাবে এই পণ্য বাজারে বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে। হাসি এখন একটু দুশ্চিন্তামুক্ত হলো।

উপরের গল্পে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আফজাল হোসেন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ তৈরি করেছেন।

তিনি যে ফর্মুলা ব্যবহার করে হাসি দই তৈরি করেছেন, সেটি অন্য দইয়ের ফর্মুলা থেকে ভিন্ন। তাই এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। এরপর তিনি এটি বাজারজাত করেছেন।

বাজার থেকে যারা হাসি দই কিনছে, তারা কিন্তু শুধু পণ্য হিসেবে ব্যক্তিগত কাজে এটি কিনছে। অর্থাৎ এই দই কেনার সময় তারা দইটি শুধু খাবার অধিকার পাচ্ছেন।

এক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

ব্যক্তিগত কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে কেনার সময় পণ্যটি একজন মানুষ ব্যবহারের সুযোগ পেলেও সেটি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের অধিকার পান না।

অন্যদিকে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান যারা প্রায় হুবহু হাসি দইয়ের আদলে বাজারে হাস দই ছেড়েছেন তারা পণ্যটিকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করছেন।

বাণিজ্যিক কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করতে গেলে অবশ্যই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদটির যিনি স্বত্বাধিকারী তার থেকে যথাযথ আনুষ্ঠানিক অনুমতি নিয়ে, তার সঙ্গে চুক্তিপত্র করে তবেই বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যাবে।

এবারে আমরা একটি কাজ করি, নিচে বেশকিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সেগুলো থেকে আমরা বের করি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদটি ব্যক্তিগত কাজে নাকি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ব্যবহারটি যথাযথ হচ্ছে কি না।

ক. মিজান বাংলা সিনেমা দেখার জন্য একটি ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করল। সেখানে নির্দিষ্ট ফি পরিশোধ করে তাদের গ্রাহক হলো। কিন্তু ওই ওয়েবসাইটে সিনেমাটি দেখানোর জন্য সিনেমার প্রযোজকের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা হয়নি। মিজান এখন খুশি মনে পছন্দের সিনেমা দেখছে।

সিদ্ধান্ত : মিজান ব্যক্তিগত কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করছে। কিন্তু ওয়েবসাইটটি সিনেমাটি প্রদর্শনের অনুমতি না নিয়েই তাদের প্ল্যাটফরমে বাণিজ্যিক কাজে সেটি ব্যবহার করছে। কাজেই তারা নিয়ম মানছে না ও সিনেমার প্রযোজক ওয়েবসাইটের স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

খ. মিতু প্রয়োজনীয় একটি সফটওয়্যার অনলাইনে খুঁজতে গিয়ে দেখল ৫০ টাকা দিয়ে সফটওয়্যারটির প্রস্তুতকারক কোম্পানি থেকে লাইসেন্স কিনে নিতে হবে। মিতুর বন্ধু হেনা বলল, আমার কাছেই সফটওয়্যারটি আছে, কেনার কোনো প্রয়োজন নেই, তুই আমার কাছ থেকে সফটওয়্যারটি কপি করে নিস। মিতু বলল এটা একদম উচিত হবে না। তখন সফটওয়্যারটি কেনার যথাযথ ওয়েবসাইটে গিয়ে সেটির লাইসেন্স কিনে নিয়ে মিতু এখন ব্যবহার করছে।	
সিদ্ধান্ত :	

গ. একটি বিখ্যাত কোমল পানীয় তৈরির কোম্পানি তাদের ফর্মুলা বাংলাদেশের একটি বাজারজাতকরণ কোম্পানির কাছে চুক্তিবদ্ধ হয়ে প্রদান করল। কিন্তু অন্য আরেকটি কোম্পানি সেই একই কোমল পানীয়'র নামে বাজারে পণ্য বিক্রি শুরু করল। তখন যে কোম্পানি এই ফর্মুলা কিনে নিয়েছিল, তারা আদালতের দ্বারস্থ হলো।	
সিদ্ধান্ত :	

ঘ. রায়হান একটি ভ্রমণবিষয়ক বই লিখেছে তার ভ্রমণ করা বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতা নিয়ে। রায়হান একটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মেধাস্বত্ব পাবার শর্তে বইটি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানটি এই বছর বইমেলায় বইটি প্রকাশ করেছে ও বইটি পাঠকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

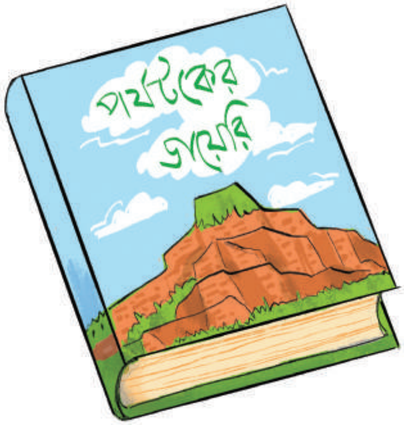

সিদ্ধান্ত :

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সেশন–২: স্বত্বাধিকারীর অধিকার সংরক্ষণ

আমরা আগের সেশনে পড়া গল্পে জেনেছিলাম বাণিজ্যিক কাজে হাসি দইয়ের অপব্যবহারের কারণে আফজাল হোসেন আদালতে মামলা করে ক্ষতিপূরণ দাবি করার কথা ভাবছেন। তবে আফজাল হোসেন ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারতেন না যদি তার ট্রেডমার্ক না করা থাকত। আমরা এর আগে ষষ্ঠ শ্রেণিতে কপিরাইট ও পেটেন্ট সম্পর্কে জেনেছিলাম। কিন্তু ট্রেডমার্ক জিনিসটা কী?

ট্রেডমার্ক হলো কোনো স্বতন্ত্র প্রতীক বা লোগো বা নাম বা স্লোগান যেটি দিয়ে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে একই ধরনের অন্য কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ থেকে পার্থক্য করা যায়।

একটি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করার সময় তাদের সেই সম্পদের জন্য নির্দিষ্ট ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করেন। ফলে অন্য কেউ চাইলেই ইচ্ছেমতো তার সেই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নকল করে বাজারজাত করতে পারেন না।

এর ফলে স্বত্বাধিকারীর অধিকার সংরক্ষিত হয় ও অন্য কেউ তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অপব্যবহার করতে গেলে তিনি আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

বাংলাদেশ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization বা WTO)-এর একটি সদস্য দেশ। তাই এই সংস্থার তৈরি করা নিয়ম অনুসরণ করে বাংলাদেশে ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের সুযোগ আছে।

একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের জন্য ৫টি ধাপ অনুসরণ করতে হয়–

ক. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে প্রথমে সেটি পূরণ করতে হয়। এই ফর্মে বিস্তারিত জানাতে হয় আমরা কেন এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারী হিসেবে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করতে চাচ্ছি।

খ. অধিদপ্তরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা আবেদনটি যাচাই-বাছাই করবেন যে সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি আসলেই একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কি না, সম্পদটি ট্রেডমার্ক পাবার যোগ্য কি না, একই রকম অন্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের সঙ্গে এই ট্রেডমার্ক হুবহু মিলে যাচ্ছে কি না, ইত্যাদি।

গ. অধিদপ্তর আবেদনটি গ্রহণযোগ্য হিসেবে পেলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেবে ও অন্য কোনো একই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ট্রেডমার্ক ধারণকারী কোনো স্বত্বাধিকারীর এই নতুন ট্রেডমার্কের ব্যাপারে আপত্তি আছে কি না, সেটি জানতে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ঘ. অন্য কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারী যদি নিজের ট্রেডমার্কের সঙ্গে নতুন ট্রেডমার্কের মিল খুঁজে পান, তাহলে তিনি নিজের আপত্তি জানাতে পারেন। এজন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফর্ম পূরণ করে তাকে জমা দিতে হয়। এ সময় তিনি যুক্তি প্রদান করবেন, কেন নতুন ট্রেডমার্কটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবার যিনি ট্রেডমার্কের জন্য আবেদন করেছেন, তিনি নিজের ট্রেডমার্কের পক্ষে যুক্তি প্রদান করবেন। এরপর অধিদপ্তর দুই পক্ষের সকল যুক্তি বিবেচনা করে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।

ঙ. সবশেষে যদি অধিদপ্তর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় যে আবেদনকারীকে এই ট্রেডমার্ক প্রদান করা হবে, তাহলে ট্রেডমার্কের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়। নিবন্ধিত হবার প্রমাণপত্র হিসেবে একটি ট্রেডমার্ক সনদ ঐ স্বত্বাধিকারীর নামে প্রদান করা হয়।

আমরা এই শিখন অভিজ্ঞতার একদম শেষে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে যথাযথভাবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করতে যাচ্ছি, তাই না? এবারে একটি কাজ করি।

সেই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের জন্য কল্পনা থেকে ট্রেডমার্ক হিসেবে কোনো লোগো বা ছবি বা ডিজাইন পরের পৃষ্ঠায় এঁকে ফেলি–

এবারে চলো আরেকটি কাজ করি। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের জন্য ট্রেডমার্কের আবেদন করার একটি নমুনা ফর্ম আমরা পূরণ করে ফেলি। এখানে যে তথ্যগুলো যেমন মোবাইল ফোন নম্বর ও ই-মেইল তোমার থাকবে না, সেগুলো চাইলে কাল্পনিক একটা তথ্য দিয়ে দিতে পারো।

আবেদনকারীর নাম : ....

জাতীয়তা : ....

ঠিকানা : ....

মোবাইল নং : .... ই-মেইল : ....

পণ্যের বিবরণ : ....

....

মার্কের প্রতিরূপ (ডিজাইন) :

স্বাক্ষর ও তারিখ : ....

ট্রেডমার্কের মূল আবেদনপত্র দেখতে হুবহু একইরকম না হলেও এখানে নমুনা ফর্মে আমরা আবেদনপত্রের অংশগুলো পূরণ করেছি। আমরা যখন নিজেরা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের জন্য ট্রেডমার্কের আবেদন করব তখন আনুষ্ঠানিকভাবে (অফিসিয়াল) ফর্মটি পূরণ করতে হবে।

ইন্টারনেটের সংযোগ থাকলে আমোদের ইচ্ছা হলে http://www.dpdt.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে ট্রেডমার্কের আবেদন ফর্ম চাইলে ডাউনলোড করে দেখতে পারি।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি :

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ট্রেডমার্কের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক অপব্যবহারের ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কোম্পানি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পত্রপত্রিকা বা অনলাইন সংবাদ মাধ্যম থেকে আমরা এ রকম কিছু ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করি পরের সেশনের জন্য। পাশাপাশি এই ঘটনাগুলোর কোনটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে হয়েছে ও কোনটি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে হয়েছে সেটিও ভাবি।

সেশন–৩: ট্রেডমার্কজনিত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি

আমরা বাড়িতে বেশকিছু ঘটনা নিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করেছি যেগুলো ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত ছিল। এবারে আমরা এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করব।

প্রতিবেদন তৈরির জন্য এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে–

১. সবার প্রথমে শিক্ষক আমাদের সবাইকে কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন।

২. নিজেদের দলের সকল সদস্য যে ঘটনাগুলোর তথ্য অনুসন্ধান করেছিলাম, সেগুলো নিয়ে একসঙ্গে বসে আলোচনা করব যে, কোন ঘটনাটি নিয়ে আমরা প্রতিবেদন তৈরি করব।

৩. আমাদের একটি নির্দিষ্ট ঘটনা নির্বাচন করতে হবে। ঘটনা নির্বাচনের সময় নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রকাশিত সংবাদে আছে কি না, যাচাই করব। একটি ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত সংবাদে যদি এই বিষয়গুলো উপস্থিত থাকে, শুধু তাহলেই আমরা সেটি নিয়ে কাজ করতে পারব–

প্রাথমিক প্রশ্ন	আইনি ঘটনাটি কি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ? ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই পক্ষের ব্যাপারে তথ্য দেওয়া আছে?
পরবর্তী প্রশ্ন	ব্যক্তিগত নাকি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার নিয়ে সমস্যা হয়েছে? দুই পক্ষের বক্তব্যই সংবাদে আছে কি?
চূড়ান্ত প্রশ্ন	আদালতে কী রকম প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে? চূড়ান্ত রায় প্রদান করা হয়েছে নাকি এখনো রায় প্রদান করা হয়নি?

৪. এভাবে আমরা দলগতভাবে একটি ঘটনা নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলাম। কাজের সুবিধার্থে উপরে উল্লেখিত ছয়টি প্রশ্নের প্রাপ্ত উত্তর নিচে লিখে ফেলি–

৫. এবার আমরা আমাদের নির্বাচিত ঘটনার বিভিন্ন তথ্য নিয়ে নিজেদের দলে আলোচনা করব ও পুরো ঘটনা বিশ্লেষণ করব। বিশ্লেষণ করে আমরা কী সিদ্ধান্তে এলাম ও আইনি সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা একমত কি না, বা আমাদের এক্ষেত্রে ভাবনাগুলো কী রকম সেটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে ফেলব।

আমাদের প্রতিবেদনের মূল অংশ নিচের ছকে লিখে ফেলি–

৬। এবারে দলগতভাবে আমাদের তৈরি করা প্রতিবেদন নিয়ে শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করি।

আমরা যখন নিজেদের তৈরি করা সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কাউকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে দেব, আমাদেরও খেয়াল রাখতে হবে আমরা কোনো নীতিমালা ভঙ্গ করছি কি না বা কোনো স্বত্বাধিকারীর অধিকার ক্ষুণ্ন করছি কি না! কারণ এমন হলে অন্য কেউ একইভাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

সেশন–৪: বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহারের নীতিমালা বানাই

রিতু সম্প্রতি একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করেছে, যেটি দিয়ে নিজের বাসায় থাকা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন–বাতি, পাখা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

এই সফটওয়্যারটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ট্রেডমার্কও করিয়েছে যেন এটিকে বাজারজাত করতে পারে। একদিন বাবা বললেন, 'তুমি যে সফটওয়্যার তৈরি করেছ, এটার যারা ব্যবহারকারী হবে তাদের জন্য কোনো নীতিমালা বানিয়েছ?'

এটা শুনে রিতু বেশ অবাক হয়ে বলল, 'সফটওয়্যারটি কীভাবে চালাতে হবে সেটির নির্দেশনামালা তৈরি করেছি। কিন্তু ব্যবহারকারীর জন্য আবার কী নীতিমালা বানাব?'

তখন বাবা বললেন, 'দেখো আমরা যখন কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করি, তখন প্রথমেই কিছু নীতিমালা আমাদের প্রদর্শন করে।

অর্থাৎ ঐ সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে সেটা আমাদের জানিয়ে দেয়। সেই নিয়মগুলো মানতে আমরা সম্মতি জানালে তখনই কেবল সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা যায়।

নইলে যে কেউ তোমার তৈরি সফটওয়্যার ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা শুরু করবে বা সেটা পুনরায় বাজারজাত করে দিতে পারে। আর এটা শুধু সফটওয়্যার নয়, যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদই ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি করা উচিত। তাহলে সেই সম্পদ কেউ অপব্যবহার করার সুযোগ পাবে না।

সব শুনে রিতু বুঝল তাকে এখন নিজের সফটওয়্যারের জন্যই এরকম নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

উপরের গল্প থেকে আমরা যেটি বুঝলাম বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ যারা ব্যবহার করবে, তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী বিধিনিষেধ থাকবে তা স্বত্বাধিকারীকে তৈরি করে দিতে হবে।

যেমন, ধরি একটি ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ-ইন করে বিভিন্ন সিনেমা দেখা যায়। এখন ওয়েবসাইট নির্মাতারা চান একজন তাদের ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করলে শুধু একজনই যেন সকল কনটেন্ট উপভোগ করেন।

অর্থাৎ একই অ্যাকাউন্ট দিয়ে যেন একাধিক মানুষ কনটেন্ট উপভোগ না করেন। কেননা, এরকম হলে তাদের আর্থিক ক্ষতি হবে, একই অ্যাকাউন্ট থেকে ১০০ জনও তাদের কনটেন্ট দেখতে পারে।

এক্ষেত্রে অনলাইন প্ল্যাটফরমকে তাদের ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি নীতিমালায় যুক্ত করে দিতে হবে যে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো অবস্থাতেই একাধিক ব্যবহারকারী কনটেন্ট দেখতে পারবেন না।

ঠিক একইভাবে যে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারীদের জন্য এরকম নীতিমালা তৈরি করতে হয়।

আমরা এর আগের সেশনে বেশকিছু ট্রেডমার্ক-সংক্রান্ত আইনি ঘটনা দলগতভাবে উপস্থাপন করেছিলাম।

সেখানে এ রকম বেশকিছু মামলা সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়েছি ও কোন মামলায় কী কী সমস্যা ছিল সেটিও আমরা জেনেছি। এবারে আমরা নিচের কাজটি করে ফেলি–

১. বিভিন্ন মামলা সম্পর্কে যে ধারণা পেয়েছি, তার আলোকে আমরা কিছু নীতির কথা চিন্তা করি যেগুলো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য রাখা উচিত।

২. দলের সবাই মিলে আলোচনা করার পরে এবার যে নীতিগুলো আমাদের রাখা উচিত মনে হয়, সেগুলো নিচের ছকে লিখে ফেলি। লেখার সময়ে কোন নীতিগুলো ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আর কোনগুলো বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য সেটিও টিক চিহ্ন দিয়ে উল্লেখ করি।

ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত নীতি		
প্রস্তাবিত নীতি	ব্যক্তিগত ব্যবহার	বাণিজ্যিক ব্যবহার

ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত নীতি		
প্রস্তাবিত নীতি	ব্যক্তিগত ব্যবহার	বাণিজ্যিক ব্যবহার

৩. আমরা যে নীতিমালাগুলো ভেবেছি, তার মধ্যে কিছু নিয়ম ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হবে। আবার একইভাবে কিছু নিয়ম বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হবে। সেভাবেই আমরা চিহ্নিত করেছি। এবারে সবগুলো নিয়মগুলো সমন্বয় করে আমরা যে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি, সেটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা কোন নীতিমালা অনুসরণ করব, সেটি উল্লেখ করে একটি আর্টিকেল তৈরি করি। আর্টিকেলের প্রধান অংশ নিচে উল্লেখ করি–

সেশন–৫: বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে যথাযথ বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী বানাই

(অনুসন্ধানমূলক কাজ)

আমরা তো বিভিন্ন রকম বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কে আগেও জেনেছি। নিজেদের এলাকা বা জেলার কী কী বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ থাকতে পারে? একটি এলাকার নির্দিষ্ট কোনো খাবার, কোনো ঐতিহ্যবাহী বাড়ি বা স্থান, গান, শ্লোক, নাচ, শব্দ বা ভাষা কিংবা সেই এলাকার কোনো বাদ্যযন্ত্র, স্থাপনা ইত্যাদি হতে পারে সেই এলাকার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। আমরা কি নিজেদের এলাকার এমন কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের কথা জানি যেটা হয়তো এখন আর বাকিদের কাছে সেভাবে পরিচিত নয় অথবা সেটির কোনো ট্রেডমার্ক করা নেই? আমরা এবার আমাদের নিজেদের এলাকার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি–

১. আমরা প্রথমে আগের মতো প্রতিটি দল নিজেদের এলাকায় বা জেলায় এমন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ খুঁজব।

২. শিক্ষকের অনুমতিক্রমে এই অনুসন্ধানের জন্য অনেক দীর্ঘ সময় নেওয়া যেতে পারে।

৩. এক্ষেত্রে এলাকার বিভিন্ন মানুষের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কারণ, তাদের কাছে এমন উপাদানের ব্যাপারে তথ্য থাকতে পারে।

৪. এরপর আমাদের নির্বাচিত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংগ্রহ করার পর বিস্তারিত কনটেন্ট আমরা সংগ্রহ করব। কনটেন্ট হিসেবে এখানে কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি কিছু হতে পারে।

৫. এবারে সেই কনটেন্ট আমরা বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করে তুলব। বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য সম্পদটিকে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করতে হবে। আমরা এর আগে জেনেছি কীভাবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের জন্য ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করতে হয়। নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা ঐ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের জন্য আবেদন করব।

৬. এক্ষেত্রে অবশ্যই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের মূল স্বত্বাধিকারীকে প্রথমে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কী ও সেটির ট্রেডমার্ক করার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে হবে। কাজেই তোমাদের দলকে, মূল স্বত্বাধিকারীকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে হবে, যেন তিনি সম্মত হন তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করার জন্য।

৭. এরপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ট্রেডমার্কের নিবন্ধনের আবেদন করে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীকে তার পরবর্তী দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে।

৮. এরপর ঐ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বাণিজ্যিক ব্যবহারের একটি নীতিমালা তৈরি করতে হবে। এই নীতিমালা তৈরিতেও মূল স্বত্বাধিকারীকে তোমরা সাহায্য করবে বইয়ে দেখানো নিয়ম অনুসরণ করে।

৯. তাহলে তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদটি যথাযথ বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করতে তোমরা সহায়তা করতে পারবে।

নিশ্চয়ই পুরো কাজটি শেষ করার পর তোমার এলাকার সেই স্বত্বাধিকারী অনেক উপকৃত হবেন। পাশাপাশি তুমি নিজেও যখন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারী হবে, তোমারও এই পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। দারুণ না? একজনের উপকার করতে গিয়ে তোমাদের দলের সবাই নিজেরাও চমৎকার একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করলে।

আমাদের পুরো কাজ করার সময়ে নিচের ছক অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন সপ্তাহে বিভিন্ন কাজ করব–

সপ্তাহ	কাজ
১ম ও ২য় সপ্তাহ	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অনুসন্ধান কেন্দ্র হবে।
৩য় সপ্তাহ	দলের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া কোন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নিয়ে কাজ করা হবে।
৪র্থ সপ্তাহ	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে কনটেন্ট আকারে সংগ্রহ করা।
৫ম সপ্তাহ	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের মূল স্বত্বাধিকারীকে তার সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে যথাযথ ধারণা প্রদান।
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের জন্য আবেদন।
৭ম সপ্তাহ	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদটির বাণিজ্যিক ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি।
৮ম সপ্তাহ	শ্রেণিকক্ষে নিজেদের পুরো কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময়।

দেখেছ কী সুন্দর একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নিয়ে এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা কাজ করেছি? তোমাকে ও তোমার দলকে অভিনন্দন! একইভাবে তুমি নিজে যখন কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ তৈরি করবে সেটির ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ধাপগুলো অনুসরণ করবে। তাহলে কেউ তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদটির অপব্যবহার করতে পারবে না।

শিখন অভিজ্ঞতা ৩ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি

বাস্তব জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের পরিচিতি থাকে। বিদ্যালয়ে বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এক ধরনের পরিচিতি, আবার ব্যক্তিগত বা বন্ধুবান্ধবের কাছে আরেক ধরনের পরিচিতি থাকে। আরেকটা জগতেও এখন আমাদের পরিচিতি থাকে, সেটি হলো ভার্চুয়াল জগৎ। ভার্চুয়াল জগৎ হলো যেখানে সরাসরি আমাকে কেউ দেখে না, কিন্তু আমার ডিজিটাল উপস্থিতি দেখে। বেশিরভাগ জায়গাতেই আমাদের নিজেদের পরিচিতি দিয়ে কাজ করতে হয়। এজন্য আমাদের জেনে নেওয়া উচিত যে কী করে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করতে হয়, ভার্চুয়াল পরিচিতির জন্য কী কী তথ্য দেওয়া উচিত বা ভার্চুয়াল পরিচিতির নৈতিক দিকগুলোই-বা কী। আমরা আগামী কয়েকটি সেশনে কিছু কাজের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করব।

সেশন–১: ভার্চুয়াল পরিচিতির ধারণা

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি! আমাদের ভার্চুয়াল পরিচিতি বিষয়ে সবারই মোটামুটি আগের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে, তখন ঠিক জানতাম না যে এটিই ভার্চুয়াল পরিচিতি। আমরা কত জায়গায় কত তথ্য দিই যা পরে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট/অন্য প্লাটফরমে দেখতে পাই। প্রয়োজনীয় কোনো সেবা গ্রহণ করতে আমাদের প্রথমেই আমাদের একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয়। সেজন্য সেই সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে আমাদের নিবন্ধন করতে হয়। পরের পৃষ্ঠায় দেয়া ছবিতে একজনের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি ভার্চুয়াল পরিচিতি দেখতে পাচ্ছি। এবার আমরা বের করি এই ভার্চুয়াল পরিচিতিতে কী কী তথ্য দেওয়া হয়েছে...

অলিনা কবীর

ব্যক্তিগত তথ্য	
নাম:	অলিনা কবীর
আইডি/রোল নং :	০০২২৬৬৫০
মাতার নাম :	ফেরদৌস আরা ইমা
পিতার নাম :	হুমায়ুন কবীর
জন্ম তারিখ :	০১/০১/২০১০
ঠিকানা :	কাপাশিয়া, গাজীপুর
স্কুলের নাম :	চিনাডুলি হাই স্কুল
শ্রেণি :	৭ম
শখ :	ছবি আঁকা
যোগাযোগ :	kabir@email.com

উপরের ছবিতে অলিনা কী কী তথ্য প্রকাশ করেছে সেগুলো নিচের ঘরে লিখি :

	পিতার নাম	
	জন্ম তারিখ	

ভার্চুয়াল পরিচিতি

ভার্চুয়াল পরিচিতি হলো আমাদের সম্পর্কে দেওয়া কিছু তথ্য যা ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যবহার করার জন্য একটি পরিচিতি। যেমন–আমাদের রোল নম্বর। এটি কিন্তু আমার নাম বা ছবি নয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করলে এটি দিয়ে আমাকে চিনে ফেলা যেতে পারে। অনেক সময় আমরা ছদ্মনামেও আমাদের পরিচিতি তুলে ধরি, তখন সরাসরি আমাদের নিজের পরিচয় প্রকাশ করি না। এখন মনে করি, আমার প্রিয় প্রাণী সিংহ। আমি স্কুলের দেয়ালিকায় নিজের পরিচিতিতে সব সময় একটি সিংহের ছবি দিচ্ছি। আস্তে আস্তে সবাই আমাকে এই ছবি দিয়ে চেনা শুরু করবে। যেহেতু ডিজিটাল মাধ্যমে সবকিছু খুব দ্রুত আর বড় পরিসরে হয়, তাই সেখানে এই চেনার কাজটি ধীরে হবে না; বরং খুব দ্রুত অনেক বেশি মানুষের মধ্যে এটি ছড়িয়ে যাবে। কাজেই সেখানে সবকিছু একটু ভেবেচিন্তে করা ভালো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুল বা ছদ্ম পরিচয় দিলে চলবে না, এতে আমাদের সমস্যা হতে পারে। যেমন আমি সরকারি কোনো একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধন করলাম। সেখানে আমি ছদ্মনাম ও ছদ্মছবি ব্যবহার করলে তথ্য যাচাইয়ে আমাকে তারা সেবাটা দেবে না। তাই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের আসল পরিচিতি তুলে ধরতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিশ্বস্ত কোনো ওয়েবসাইট ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া যাবে না।

[

আমরা এখন একটি কাজ করব। নিচে দুইজন পেশাজীবীর ছবি দেওয়া আছে।

ডাক্তার

শিক্ষক

আমরা ৬টি দলে ভাগ হয়ে যাব এবং প্রতিটি দল উপরের যে কোনো একজন পেশাজীবী সম্পর্কে লিখব যে তাঁদের কী কী আমাদের জানা থাকে আর কী কী জানা থাকে না। সেই পয়েন্টগুলো নিচের ছকে লিখব।

জানা	অজানা
১। নাম	১। পাসপোর্ট নম্বর
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

উপরের কাজটি করে আমরা জানলাম যে, বিখ্যাত ব্যক্তির প্রোফাইলের তথ্য ভার্চুয়াল জগতে পাওয়া গেলেও কিছু ব্যক্তিগত তথ্য রয়েছে যা আমরা জানতে পারি না। আমাদেরও এমন অনেক তথ্য ভার্চুয়াল পরিচিতির মধ্যে দেওয়া উচিত নয়।

সেশন–২: নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি

এখনকার সময়ে নিজের একটা ভার্চুয়াল পরিচিতি সবারই থাকে। সামাজিক, পারিবারিক বা শিক্ষাকেন্দ্রিক সবারই একটা পরিচিতি বা প্রোফাইল থাকে। কারও দুটি আবার কারও তিনটি প্রোফাইল বা পরিচিতি থাকে। কখনো কখনো কোনো সেবা পাবার পূর্বশর্তই হলো একটি প্রোফাইল তৈরি করা। তাই এই সেশনে আমরা অভিজ্ঞতা নেব–নৈতিক দিক বিবেচনা করে কীভাবে একটি প্রোফাইল তৈরি করা যায়।

একটি ব্যাংকের অনলাইন অ্যাপ-এর মাধ্যমে আরাফ বিদ্যালয়ের প্রতি মাসের বেতন পরিশোধের সিদ্ধান্ত নিলেন। সেজন্য তার বাবাকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে হলো। এখন সেই অ্যাপ এ প্রবেশ করলে তার বাবার কিছু তথ্য প্রোফাইলে দেখা যায়। কোনো সরকারি ই-সেবা বা বেসরকারি ই-সেবা নেবার সময় প্রতিষ্ঠানগুলোর জানা দরকার কে এই সেবাটি চাইছে। তখন সেইসব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করতে হয়। অনেক জায়গায় এটিকে অ্যাকাউন্ট বলে। অনেকটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের মতো। ঠিক যতটুকু তথ্য না হলে চলবে না ততটুকু তথ্যই দেয়ার নিয়ম। অতিরিক্ত তথ্য কখনোই দেয়া উচিত নয়। ভার্চুয়াল জগতের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো নিজের ব্যক্তিগত তথ্য। আমি যেমন আমার বাসায় মিনিটে মিনিটে কী ঘটছে সেটি মাইক দিয়ে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করি না, তেমনি আমার ব্যক্তিগত জীবনে কখন কী ঘটছে সেগুলো আগবাড়িয়ে ভার্চুয়াল জগতে জানানো উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, যে তথ্য একবার আমি ডিজিটাল মাধ্যমে রাখব সেটি চিরকালের জন্য প্রকাশ্য থেকে যাবে।

প্রোফাইল আমরা দুইভাবে তৈরি করতে পারি। কোনো সেবা নেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চাওয়া তথ্য দিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য আমাদের পরিচিতি তৈরি করা। আবার নিজেই নিজেকে ভার্চুয়াল জগতে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রোফাইল তৈরি করা। এজন্য আমার কী কী তথ্য আমি ভার্চুয়াল জগতে রাখতে পারি, সে ব্যাপারে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। আগের সেশনে আমরা দেখেছি কোন কোন তথ্য অন্যকে জানানো যায় আর কোন কোন তথ্য আমরা জানাব না। আমরা আরেকটু বড় হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা পেশাগত মাধ্যমে নিজেদের প্রোফাইল তৈরি করে সেটা সবার কাছে শেয়ার করতে পারি। নিজেদের তথ্য সবার জন্য প্রকাশ করাকে বলা হয় পাবলিক শেয়ারিং। আর যদি একদম ব্যক্তিগত তথ্য নির্দিষ্ট কারও সঙ্গে বিনিময় করি, সেটাকে বলা হয় প্রাইভেট শেয়ারিং। এই অপশনগুলো চালু বা বন্ধ রাখতে পারি। তাই প্রয়োজন অনুসারে আমরা এই ব্যবস্থা নেব। অনেক সময় যদি তেমন কোনো নিয়ম না থাকে আমরা নিজেদের ছবি ভার্চুয়াল জগতে প্রকাশ না করে অ্যাভাটার ব্যবহার করতে পারি।

অ্যাভাটার হলো ভার্চুয়াল পরিচিতির জন্য নিজের ছবি ব্যবহার না করে প্রতীকী ছবি ব্যবহার করা। কোনো কোনো সামাজিক মাধ্যমে অনেক অ্যাভাটার দেওয়া থাকে, আমরা পছন্দমতো যে কোনো একটি নিজের পরিচিতির জন্য ব্যবহার করতে পারি। আবার নিজের অ্যাভাটার নিজেও তৈরি করে নিতে পারি।

নিচের ছবিটি দেখি। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা অনেক ধরনের সরকারি সেবা নিতে পারি।

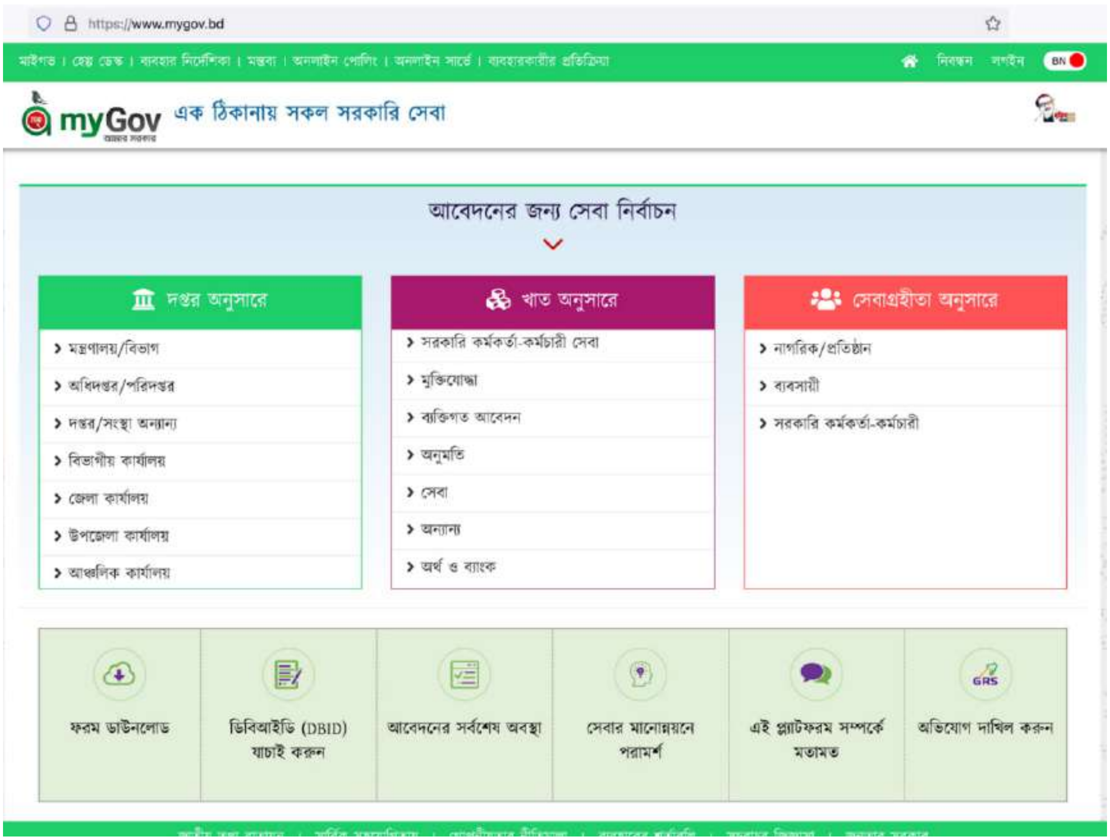

এখন আমরা উপরের ছবিতে কোথায় নিবন্ধন কথাটি আছে তা খুঁজে বের করি এবং সেটিতে গোল চিহ্ন দিই। এই নিবন্ধন কথাটির উপর চাপ দিলে নিচের ছবিটি আসবে।

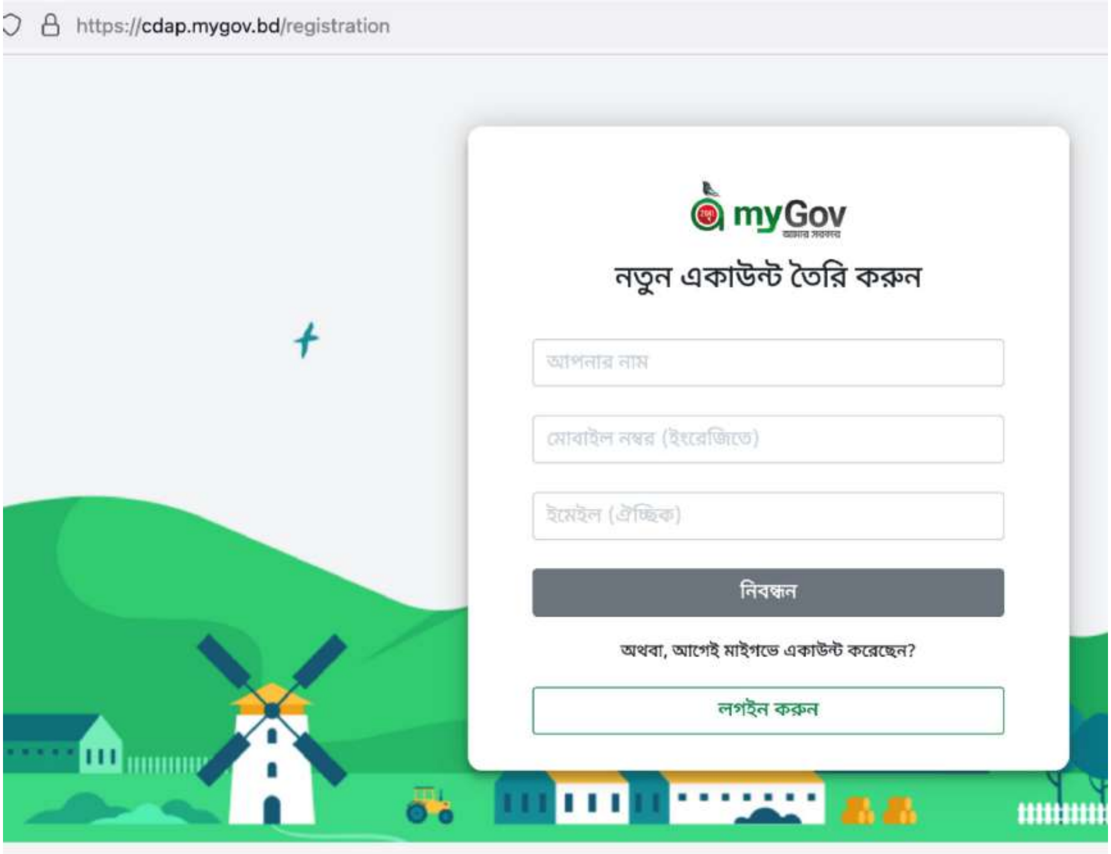

এখানে নতুন অ্যাকাউন্ট বলতে নতুন ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করা বুঝাচ্ছে। মনে রাখবে সরকারকে ভুল তথ্য দেওয়া আইনত দণ্ডনীয়। এ ধরনের ওয়েবসাইটে নিজেদের সঠিক তথ্যই দিতে হয়।

এ রকম অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে যেখান থেকে সেবা নেওয়ার আগেই আমাদের একটি অ্যাকাউন্ট বা ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করে নিতে হয়। এটি হলো সেবা গ্রহণের জন্য ভার্চুয়াল পরিচিতি।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

আমরা যদি কোনো ওয়েবসাইটে নিজেদের পছন্দমতো পরিচিতি দিতে চাই তাহলে আমাদের পরিচিতি পেজটি কেমন হবে তার একটি ডিজাইন আগাম তৈরি করে রাখি। পরের পাতায় খালি ঘরে আমাদের তথ্য দিয়ে একটি ভার্চুয়াল পরিচিতির পেজ তৈরি করি। ছবির বদলে নিজেদের আঁকা অ্যাভাটার দিব।

আমার প্রোফাইল

আমার নাম

আমার বিদ্যালয়ের নাম

আমি কী কী করতে পছন্দ করি

আমি যে ভালো কাজগুলো করেছি

সেশন–৩: ভার্চুয়াল পরিচিতি পর্যালোচনা

ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি কীভাবে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করতে হয়। আমরা হাতে লিখেও একটা প্রোফাইল তৈরি করেছিলাম। হাতে লিখে তৈরি করা প্রোফাইল বা ভার্চুয়াল প্রোফাইলের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য না থাকলেও ভার্চুয়াল প্রোফাইল সবার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাই আমাদের প্রতিটি বিষয় বিবেচনা করে আমাদের ভার্চুয়াল পরিচিতি সকলের নিকট উপস্থাপন করা উচিত। নিচে মাইক্রোসফট-এর প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের ভার্চুয়াল পরিচিতির তিনটি চিত্র দেওয়া হলো। একটি টুইটার, একটি লিংকডইন, আরেকটি ফেইসবুক থেকে নেওয়া হয়েছে। টুইটার, লিংকডইন এবং ফেইসবুক এই সবগুলোই হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এর যেকোনো একটি দেখে আমরা তুলনা করে নেব আমাদের লেখা পরিচিতির সঙ্গে এর কী কী মিল ও অমিল রয়েছে।

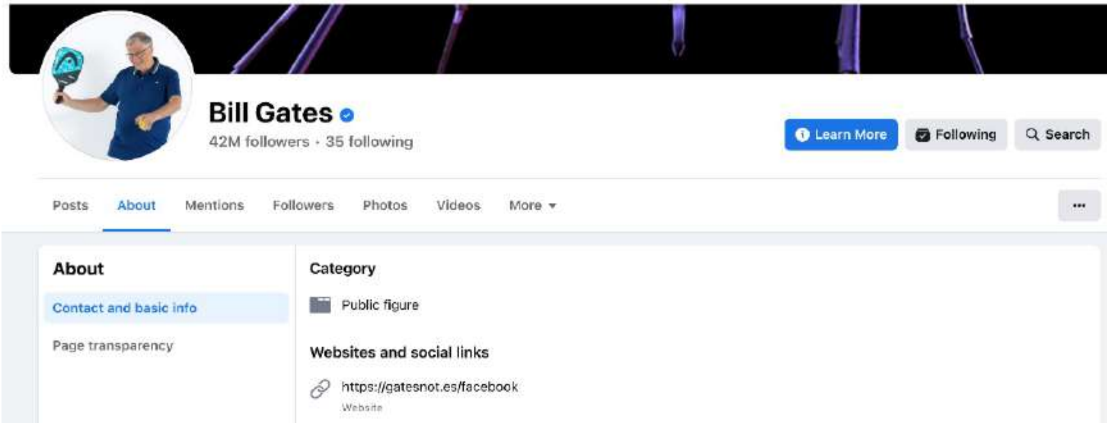

উপরের তথ্যগুলো বিবেচনা করে আমরাও তাহলে একটি প্রোফাইল বা ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করে নিই। আমাদের বয়সি শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা 'কিশোর বাতায়ন'-এর স্ক্রিনশট ফর্মটিতে নিজেদের প্রোফাইল তৈরি করার কাজটি অনুশীলন করে নিই।

এবার আমরা নিচের প্রশ্নের উত্তরগুলো দলে আলোচনা করে খোঁজার চেষ্টা করি :

১. বিল গেটসের প্রোফাইলটি কবে খোলা হয়েছে?

উত্তর :

২. বিল গেটসের প্রোফাইলটি কতজন অনুসরণ করছে?

উত্তর :

৩. কীভাবে বুঝব যে এটি তাঁর প্রকৃত প্রোফাইল বা পরিচিতি?

উত্তর :

৪. এটি ছাড়াও আর কোন কোন মাধ্যমে তার প্রোফাইল রয়েছে?

উত্তর :

৫. মাইক্রোসফট ছাড়াও বিল গেটসের আর কী কী প্রতিষ্ঠান রয়েছে?

উত্তর :

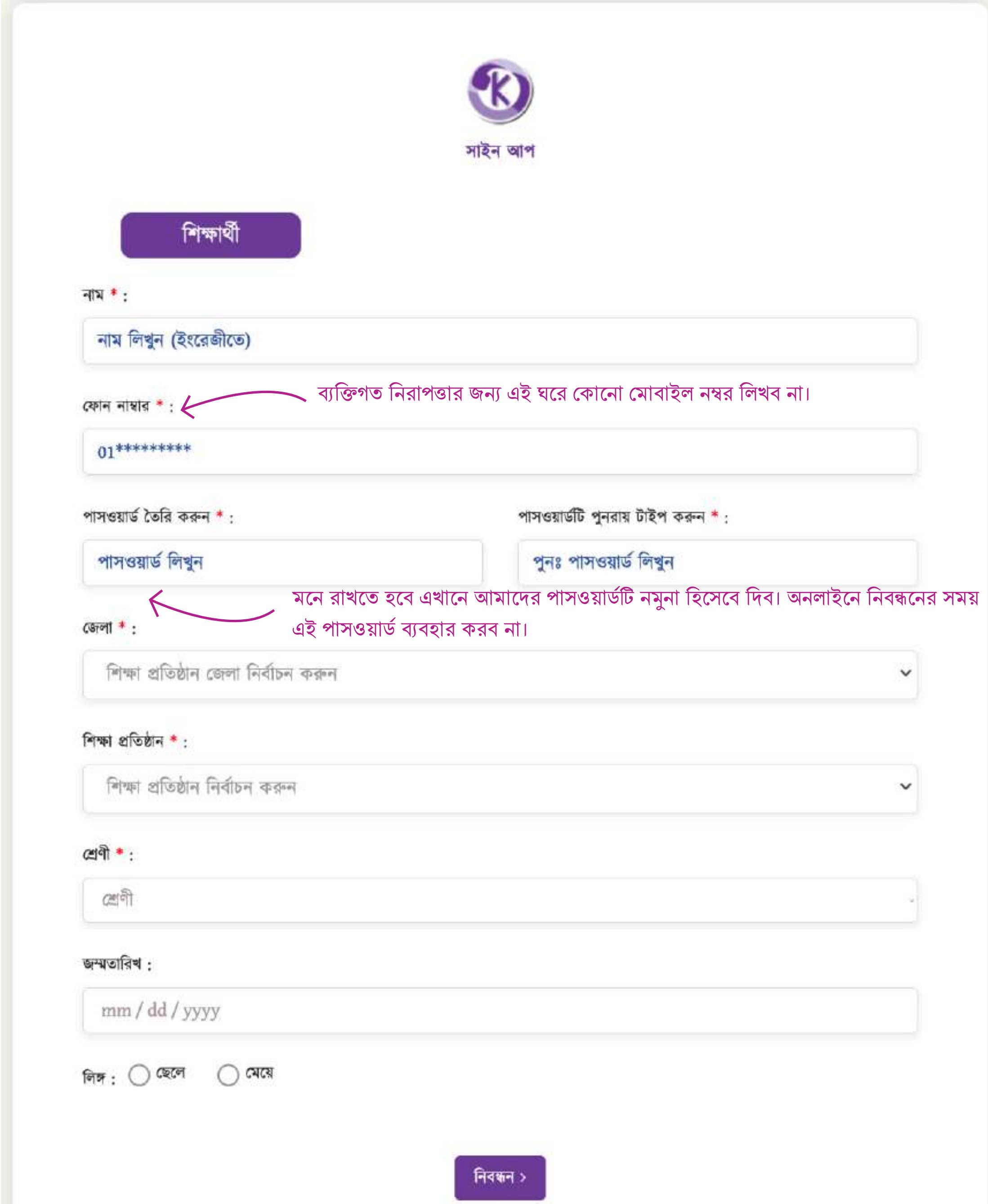
সাইন আপ
শিক্ষার্থী
নাম * :
নাম লিখুন (ইংরেজীতে)
ফোন নাম্বার * :
ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য এই ঘরে কোনো মোবাইল নম্বর লিখব না।
01*********
পাসওয়ার্ড তৈরি করুন * :
পাসওয়ার্ড লিখুন
পাসওয়ার্ডটি পুনরায় টাইপ করুন * :
পুনঃ পাসওয়ার্ড লিখুন
মনে রাখতে হবে এখানে আমাদের পাসওয়ার্ডটি নমুনা হিসেবে দিব। অনলাইনে নিবন্ধনের সময় এই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করব না।
জেলা * :
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেলা নির্বাচন করুন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান * :
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করুন
শ্রেণী * :
শ্রেণী
জন্মতারিখ :
mm / dd / yyyy
লিঙ্গ : ছেলে মেয়ে
নিবন্ধন ›

সেশন–৪: নিজের একটি ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করি

আজকে আমরা কিশোর বাতায়নে নিবন্ধন করব। আমাদের বইয়ে গতকাল যে তথ্যগুলো লিখেছিলাম সেগুলো ব্যবহার করে কিশোর বাতায়নের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন সম্পন্ন করব।

ভার্চুয়াল পরিচিতি ব্যবহারের নৈতিক দিক

অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে আমাদের কোনো পরিচিত মানুষ ভুল করে অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য তার ভার্চুয়াল পরিচিতিতে দিয়ে দিয়েছে। এর অর্থ হলো আমরা ডিজিটাল মাধ্যমে হঠাৎ করে তার ব্যাপারে এমন কিছু জেনে ফেলেছি যেটি আমাদের জানার কথা নয়। তাহলে কি আমরা সেই তথ্যের অপব্যবহার করব? কখনোই না। আমরা তাকে নিরাপদভাবে জানিয়ে দিব যেন সে তথ্যটি মুছে ফেলে। আমরা কি কখনো আমার ভার্চুয়াল পরিচিতিতে নিজে যা নই সেটি দাবি করব? প্রথমত, কখনো নিজের ব্যাপারে ভুল বা অতিরঞ্জিত তথ্য একবার ডিজিটাল মাধ্যমে চলে গেলে সেটি মুছে ফেলা প্রায় অসম্ভব। কাজেই আমরা এমন কোনো কাজ করব না যেটি ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরও আতঙ্ক হয়ে আমাদের তাড়া করে বেড়াবে।

কিশোর বাতায়ন বা কানেক্ট-এ রেজিস্ট্রেশন বা সাইন আপ করার পর আমার ভার্চুয়াল পরিচিতির বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার জন্য আমাকে তথ্য সম্পাদনা করতে হবে। কী কী তথ্য দিতে হয় তা পরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে। সে অনুযায়ী আমরা তথ্য প্রদান করব।

www.konnect.edu.bd

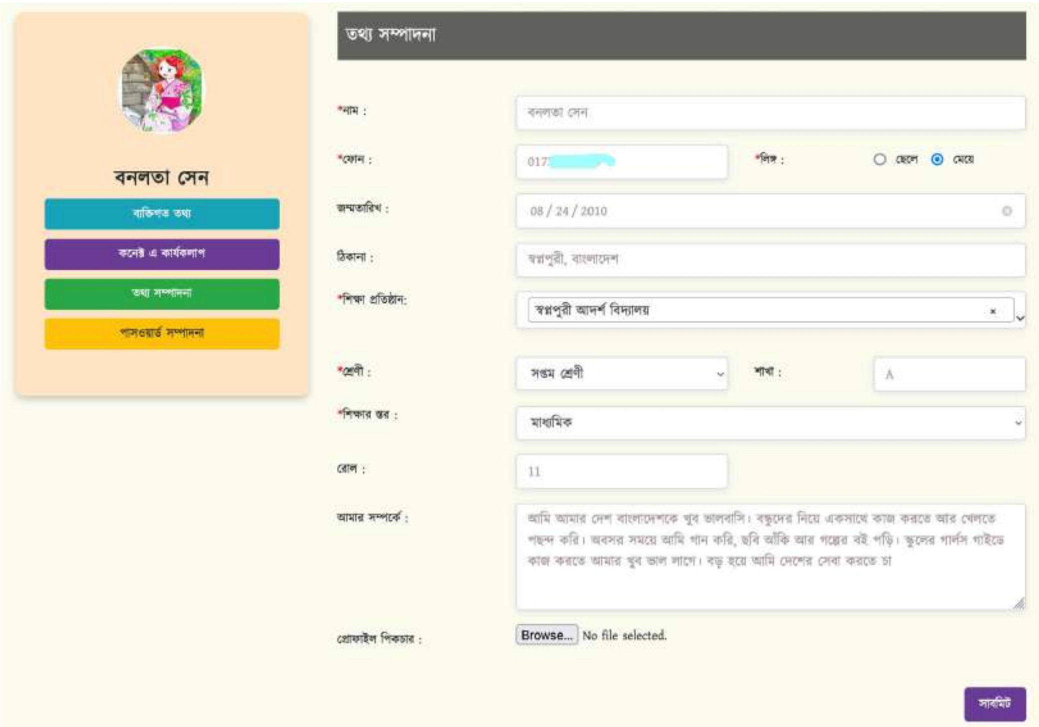

কিশোর বাতায়নের মতো করেই আরও অনেক সেবা নেওয়ার জন্য পরবর্তী সময়ে আমাদের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করতে হবে। ই-কমার্স বা নাগরিক সেবা নিতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আমাদের নিজস্ব তথ্য দিয়ে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করতে হয়। নিরাপদ ওয়েবসাইটে আমাদের সঠিক তথ্য ও ছবি দিতে হয়, আবার যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেখানে নিজের সব পরিচয় প্রকাশ করাও ঠিক নয়। এমন অনেক মাধ্যম রয়েছে, যেখানে সকল তথ্য দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ, এজন্য আমাদের নিরাপদ ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করা জরুরি।

শিখন অভিজ্ঞতা ৪

সাইবার গোয়েন্দাগিরি

বন্ধুরা এবার আমরা সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জানব। সাইবার হচ্ছে আলাদা একটা জগৎ, যেখানে আমাদের একটি ভার্চুয়াল পরিচয় থাকে। আমাদের সেই জগতের নিরাপত্তা সম্পর্কে জানতে হবে, সেই জগতে কীভাবে আমরা নিজেদের নিরাপদ রাখব এবং পরিবার ও সমাজকে নিরাপদে রাখব সেইসব বিষয় আমরা সাইবারে গোয়েন্দাগিরিতে শিখব। সব সময় মনে রাখবে যে সাইবার জগৎ এবং বাস্তব জগৎ একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। যে কোনো একটিতে সমস্যা হলে অন্যটিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমাদের এই ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। আমরা নিজেরা সচেতন হব এবং কীভাবে সবাইকে সচেতন করা যায় সেটি নিয়ে কাজ করব।

পিনা-কে তো তোমরা সবাই চেনো, ক্লাস সিক্সে ই-মেইল পাঠানোর সময় তোমাদের ন্যানো-এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ছোট্ট রোবট ন্যানো পিনা-কে অনেক সাহায্য করেছিল। পিনা ক্লাস সেভেনে উঠেছে। গতকাল তার অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী মামার সঙ্গে তার কথা হয়। মামা পিনাকে বলেন–'পিনা তুই এখন বড় হচ্ছিস, তোকে এখন সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে জানতে হবে। এই সাইবার জগৎ আমাদের অনেকভাবে উপকার করলেও এখানেও অনেক খারাপ মানুষ রয়েছে। যারা প্রযুক্তি ব্যবহার করে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে। এর মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের হ্যাকিং, হুমকি দেওয়া, কারও মনে কষ্ট দেওয়া, ভুল তথ্য বা গুজব ছড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি করা, অন্যের নাম ব্যবহার করে অন্যায় করে এরকম অনেক কিছু।' পিনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে 'এই ছোট্ট কম্পিউটারের মধ্যে এত কিছু ! কীভাবে মামা?' মামা বলেন, 'তুই এখন ক্লাস সেভেনে উঠেছিস। তোকে তোর শিক্ষক সব সুন্দর করে বুঝাবেন; আর হ্যাঁ স্যাররা যা বলবেন মেনে চলবি। আজ আর কথা বাড়াব না আরেক দিন কথা হবে।'

পিনা খুব চিন্তায় পড়ে গেল–একে তো সে নতুন ই-মেইল আইডি খুলেছে, এখন সে ভাবছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও আইডি খুলবে তার বড় ভাই প্লাবনের সামাজিক মাধ্যমে আইডি আছে। প্লাবন সেখানে ছবি পোস্ট দেয়। অনেকের সঙ্গে কথা বলে যোগাযোগ করে। পিনা তো এখন মহা চিন্তায় পড়ে গেল। এই কথা ভাবতে ভাবতে পিনা ঘুমিয়ে গেল। হঠাৎ তার ঘুম ভাঙলে দেখল যে, তার রুমের কম্পিউটার থেকে আলো আসছে। সঙ্গে সঙ্গে পিনা আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

পিনা:- 'ন্যানো তুমি এসেছ! কত্তদিন পর।'

ন্যানো: 'হ্যাঁ পিনা, আমি দেখলাম তুমি সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে অনেক চিন্তায় পড়ে গেছ। আমি আবার তোমার চিন্তা বুঝতে পারি আর তাই চলে এলাম সাহায্য করতে।'

পিনা: খুব ভালো করেছ ন্যানো, আমি মনে মনে তোমাকে খুঁজছিলাম। আচ্ছা বলো তো, মামা যে বললেন সাইবার অপরাধ, হ্যাকিং, আমরা নাকি নিরাপদ নই–এসব কী?

ন্যানো: এবার আমরা হব সাইবার গোয়েন্দা, তুমি সব করবে আর আমি তোমাকে সাহায্য করব গোয়েন্দাগিরিতে।

সেশন–১: সাইবার অপরাধের রকমসকম

বন্ধুরা আমাদের বাস্তব জগতে যেমন অপরাধ সংঘটিত হয়, ভার্চুয়াল জগৎ মানে সাইবার স্পেসেও নানা রকম অপরাধ সংঘটিত হয়। এই অপরাধ সংঘটিত হয় বিভিন্ন ডিভাইস যেমন–কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটসহ নানা প্রযুক্তি ডিভাইসের মাধ্যমে। এই সাইবারে যেমন খারাপ মানুষ রয়েছে, তেমনি আমাদের সাহায্য করার জন্য ভালো মানুষও রয়েছে। আমাদের জানতে হবে কোনগুলো সাইবার অপরাধ, আমরা কাদের কাছে থেকে সাহায্য নেব এবং বিপদ থেকে দূরে থাকব।

এবার চলো, আমরা বর্তমান সময়ে ঘটছে এমন কিছু সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জানি–প্রথমে আমরা একটি পত্রিকার সংবাদ পড়ব, তারপর আমরা কিছু সাইবার অপরাধের সঙ্গে জড়িত শব্দের সঙ্গে পরিচিত হব।

দৈনিক ভোরের পাখি

সাইবার অপরাধে নিরাপত্তা হুমকিতে বাংলাদেশ

বাংলাদেশেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো সাইবার অপরাধ বাড়ছে। সাইবারে অন্যতম অপরাধ হচ্ছে মিথ্যা তথ্যকে সত্য বলে তুলে ধরা এবং গুজব ছড়ানো। এমন ঘটনা বলা যেটি বাস্তবে ঘটেইনি। এসব কারণে মানুষ না বুঝেই অনেক সময় বিপদে পড়ে যায়। আরেক ধরনের অপরাধ হচ্ছে হ্যাকিং (Hacking)। হ্যাকিং অর্থ হলো কাউকে না বলে দূর থেকে তার কম্পিউটার বা ডিভাইসে ঢুকে পড়া (Access)। হ্যাকিং মানেই যে ক্ষতিকর কিছু কাজকর্ম হতে হবে তা ঠিক নয়। কম্পিউটারের মধ্যে থাকা কোনো সফটওয়্যারের ডিজাইনের সাধারণ পরিবর্তনকেও হ্যাকিং হিসেবে ধরা যেতে পারে। কারণ, এটি ওই সফটওয়্যার ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত নয়। না জানিয়ে কোনো কিছু পরিবর্তন করাও হ্যাকিংয়ের মধ্যে পড়ে। সাইবার অপরাধের মধ্যে হ্যাকিং-এর পরিমাণ সব থেকে বেশি। ভাইরাস কম্পিউটারের এমন একটি সফটওয়্যার যা ব্যাবহারকারীকে না জানিয়েই অনেক ক্ষতি করতে পারে। এমনকি নিজে নিজে ই-মেইলও পাঠিয়ে দিতে পারে। এই ভাইরাস দিয়েও অনেক সাইবার অপরাধ সংঘটিত হয়। আমরা অনেক সময় মনে করি অনলাইনে নিজের পরিচয় গোপন করে কাউকে গালমন্দ করলে কেউ বুঝবে না, আসলে কিন্তু তা নয়। আর এটিই হচ্ছে একটি সাইবার অপরাধ। একে ছদ্মবেশধারী (Imposter) বলে। সাইবারে অনেক সময় মানুষ নিজের সঠিক তথ্য দেয় না এবং অন্যের নাম ও পরিচয় নিজের বলে ধারণ করে এতে অনেক অপরাধ ঘটতে পারে।

সাইবারে অন্যকে যদি গালমন্দ করা হয় বা তার কোনো ছবি বা বক্তব্য নিয়ে অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া হয়, তাহলে সেটিও সাইবার অপরাধ। সাইবার অপরাধ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে।

আমরা সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জানতে গিয়ে নতুন কিছু শব্দের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। চলো আমরা শব্দগুলো চেনার চেষ্টা করি–

১. সাইবার নিরাপত্তা

২. সাইবার বুলিং

৩. হ্যাকিং

৪. গুজব ছড়ানো

৫. ....

৬. ....

হ্যাকিং

গুজব

সাইবার নিরাপত্তা

সাইবার বুলিং

আমরা অনেকগুলো নতুন বিষয় শিখলাম। এখন আমরা সাইবার অপরাধ কী তা জানি। কিন্তু আমাদের জানতে হবে কোনটি আসলে সাইবার অপরাধ। তাহলেই আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারব এবং সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে রাষ্ট্রকে সহায়তা করতে পারব।

সেশন–২: আমরা যখন সাইবার গোয়েন্দা:

বন্ধুরা, আজকে আমরা নিজেরাই সাইবার গোয়েন্দা হব, আমরা আমাদের আশপাশে ঘটে যাওয়া সাইবার অপরাধ খুঁজে বের করব। চলো এবার কাজে নামা যাক–আমাদের আশপাশে ঘটে যাওয়া একটি করে সাইবার অপরাধের ঘটনা চিরকুটে লিখি–ঘটনাগুলো এমন হতে হবে যা সাইবারে ঘটেছে এবং কোনো না কোনোভাবে মানুষ এবং সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে।

নমুনা ঘটনা

ঘটনা	কোন মাধ্যমে ঘটেছে?	সাইবার অপরাধ হলে টিক চিহ্ন দিই
১. মোবাইল অ্যাকাউন্টের পিন নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছে	মোবাইল এবং ইন্টারনেট	
২. অনুমতি ছাড়া অন্যের ব্যক্তিগত ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে	মোবাইল/কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট	
৩.		
৪.		
৫.		
৬.		
৭.		
৮.		
৯.		
১০.		

সেশন–৩: রুখব এবার সাইবার অপরাধ

পিনা এখন জানে কোনগুলো সাইবার অপরাধ। মানুষ এতভাবে সাইবার অপরাধ করে! কিন্তু এদের ধরার কি কোনো উপায় নেই? মানুষ কীভাবে এই অপরাধ থেকে রক্ষা পাবে?

গতকালের চিন্তা ছিল সাইবার অপরাধ কী; আর আজকে রাতে তার ঘুম আসছে না কীভাবে রুখবে এই অপরাধ? ইস যদি আজকে ন্যানো আসত! পিনা ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে যায়।
'পিনা, এই পিনা ঘুম থেকে ওঠো, আমি ন্যানো, আমি এসেছি।' পিনা দেখতে পায়, তার মাথার কাছে বসে আছে ন্যানো। 'শোনো পিনা, সাইবার অপরাধ দমনের জন্য অনেক ব্যবস্থা আছে, অনেক আইন আছে। বাংলাদেশেও অনেক আইন আছে, তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি তোমাকে দেখাচ্ছি কী করবে।

সবার প্রথমে তোমার সঙ্গে ঘটে যাওয়া সাইবার ক্রাইম তোমার মা-বাবাকে জানাবে। তাদেরকে কাছে না পেলে পরিবারে অন্য কোনো বড় সদস্যকে জানাবে। তারপর তোমার শিক্ষককে জানাবে।

পিনা, সবাই তোমাকে সাহায্য করার জন্য আছে, তাই ভয়ের কিছু নেই; কিন্তু কিছু লুকানো যাবে না।' এবার আমরা নিচের/পাশের ছকে বিভিন্ন সাইবার অপরাধের ঘটনায় কী কী করব তা কার্টুনের শূন্য স্থানে পূরণ করব।

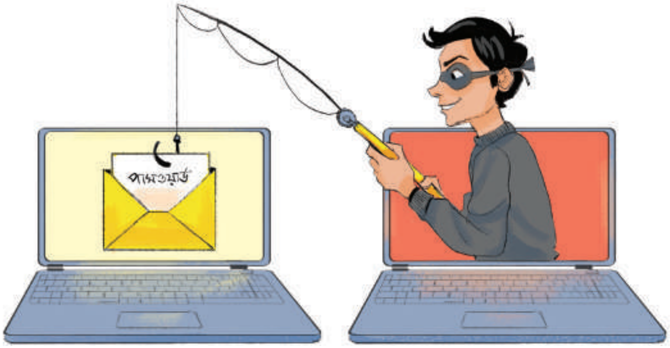

সেশন–৪: সাইবারে বিজয়

পাখির ডাকে পিনার ঘুম ভেঙে গেল। সে আজকে খুব খুশি মনে স্কুলে যাচ্ছে কারণ সে জানে সাইবার অপরাধ যেমন আছে, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও আছে । আজ সে শিক্ষককে অনেক কিছু জানাতে পারবে।

পিনা ডিজিটাল প্রযুক্তি ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করছিল, স্যার এসে বললেন, গতকাল আমরা অনেকগুলো সাইবার অপরাধ লিখেছিলাম। আজকে আমরা তার সমাধানে কী করণীয় তা খুঁজে বের করব। কিন্তু আমরা একাই এই কাজটি করব না। শ্রেণিকক্ষে করার পর বাবা-মা/পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে সমাধান করব। তারপর তাঁদের স্বাক্ষর নিয়ে জমা দিতে হবে।

বন্ধুরা চলো আমরাও পিনার সঙ্গে কাজটি করে ফেলি–

ঘটনা	কোন মাধ্যমে ঘটেছে?	সাইবার অপরাধে আমরা যা করব	আমার বাবা-মা পরিবারের সদস্য যা করবেন
১. মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের পিন নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছে	মোবাইল এবং ইন্টারনেট		
২. অনুমতি ছাড়া অন্যের ব্যক্তিগত ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে	মোবাইল/কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট		
৩. অন্যের আইডি হ্যাক করেছে			
৪. মিথ্যা/গুজব ছড়িয়েছে			
৫.			
৬.			

সেশন–৫: আমরা বানাব আমাদের সাইবার নিরাপত্তা নীতিমালা

বন্ধুরা, এবার আমরা আমাদের নিজেদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা নীতিমালা বানাব, যেখানে আমরা শপথ করব, সেই সকল নিরাপত্তা নিয়মকানুন আমরা নিজেরা মেনে চলব এবং স্কুলের অন্যদের জানাবো যেন সবাই মেনে চলে। তারপর সেই নিরাপত্তা নীতিমালাতে সকল শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আমাদের স্কুলের দেওয়ালে রেখে দেব যেন সবাই সচেতন হতে পারে। নিচের নীতিমালাটি পূরণ করব এবং সবাই মিলে যেটি তৈরি করব সেটি আলাদা কাগজে লিখবে।

আমরা ....
.... বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির .... শাখার সকল শিক্ষার্থী শপথ করছি যে সাইবার নিরাপত্তায় আমরা নিম্নলিখিত কাজগুলো কখনোই করব না বা অন্যকে উৎসাহিত করব না

১. নিজের নাম গোপন রেখে অন্যের সঙ্গে মোবাইল বা ইন্টারনেটে কথা বলব না।

২. অপরিচিত কারও কাছে নিজের বা পরিবারের কারও ব্যক্তিগত তথ্য দেব না।

৩. কাউকে সাইবার জগতে গালি দেব না বা অনুভূতিতে আঘাত দেব না।

৪. ....ভিন্নমতকে সম্মান করতে।

৫.

৬.

৭.

নীতিমালার সঙ্গে একমত শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

নাম	রোল নম্বর	স্বাক্ষর

শ্রেণির বাইরের কাজ–আমরা স্কুলের পরবর্তী ক্লাসের শিক্ষার্থীদের কাছে নিজেদের নীতিমালা উপস্থাপন করব এবং তারা এই নীতিমালার সঙ্গে একমত কি না জানব এবং উপরের ছকের মতো করে একমত শিক্ষার্থীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করব। কেউ যদি কোনো বিষয়ে একমত না হয়, সেটি নিয়ে কথা বলব এবং সবাই মিলে যেটি সঠিক বলে মনে হবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

সেশন–৬: সাইবার সচেতনতায় আমরা

পিনা বাবার সঙ্গে বসে সবগুলো সমস্যার সমাধান করেছে। এখন পিনা ভাবছে এলাকার সবাই কি জানে কীভাবে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ করতে হয়? বাবা বলেন, তুই যেভাবে আমাকে জানালি, ঠিক সেভাবে এবার জানাবি সবাইকে। পিনা খুব চিন্তায় পড়ে গেল কীভাবে সে সবাইকে জানাবে।

পরদিন ক্লাসে গিয়ে শিক্ষককে বিষয়টি জানাল। শিক্ষক বললেন, তোমাদের আশপাশের সবাইকে জানানোর দায়িত্ব তোমাদের। তোমরা একটি নাটিকা বানাবে, যেখানে তোমরা মোবাইল ফোন দিয়ে ভিডিও করে এডিট করবে। তোমাদের মূল কাজ হবে সবাইকে জানানো সাইবার অপরাধ কী এবং কীভাবে নিরাপদ থাকা যায়। যদি মোবাইল ক্যামেরা না থাকে, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই, তোমরা একটি নাটিকা বানিয়ে অভিনয় করবে। যেটি উপস্থাপন করা হবে বার্ষিক অনুষ্ঠানে। শিক্ষক, পরিবারের সদস্য এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

বন্ধুরা, এবার আমাদের কাজ হবে পিনার স্কুলশিক্ষক যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে একটি নাটিকা পরিকল্পনা করা। যেখানে কিছু ঘটনা থাকবে সাইবার অপরাধ হওয়ার এবং সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় নিয়ে। এই নাটিকার মাধ্যমে আমরা আসলে সমাজের সকলকে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জানাব। সবাই যেন সাইবার অপরাধ থেকে নিজে নিরাপদ থাকে এবং অন্যকে নিরাপদ রাখে।

দলে ভাগ হয়ে নাটিকার পরিকল্পনাটি সংক্ষেপে লিখি

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

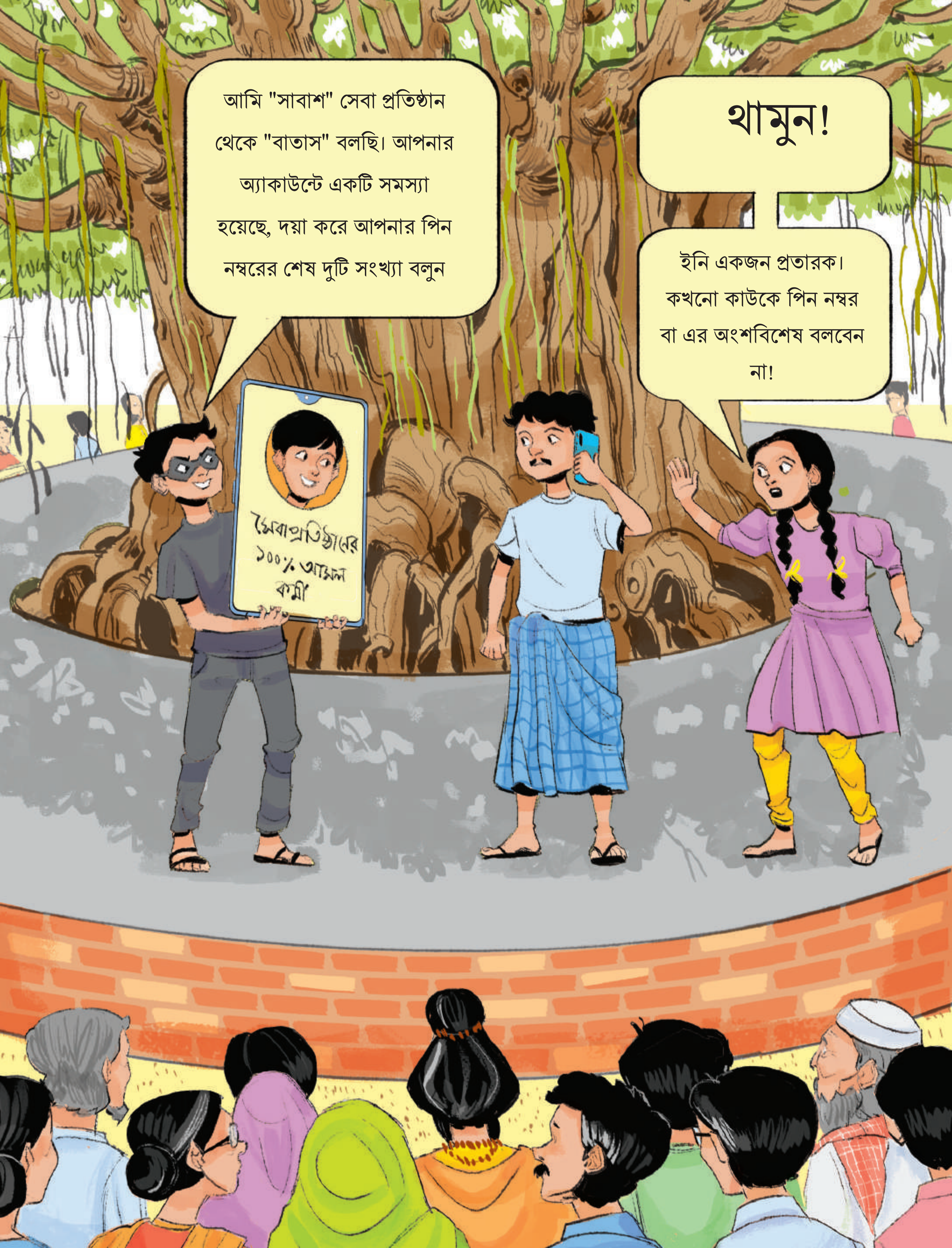
আমি "সাবাশ" সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে "বাতাস" বলছি। আপনার অ্যাকাউন্টে একটি সমস্যা হয়েছে, দয়া করে আপনার পিন নম্বরের শেষ দুটি সংখ্যা বলুন
সেবাপ্রতিষ্ঠানের ১০০% আসল কর্মী
থামুন!
ইনি একজন প্রতারক। কখনো কাউকে পিন নম্বর বা এর অংশবিশেষ বলবেন না!

শিখন অভিজ্ঞতা ৫

আমি যদি হই রোবট

মানুষ দৈনন্দিন জীবনে কত রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়! এর মধ্যে কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নিয়মিত এবং সেটার সমাধানও করতে হয়। আবার কিছু সমস্যা হয়তো নিয়মিত আসে না, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয়! আবার আমাদের সবার জীবনে কিন্তু একই রকম সমস্যার আগমন ঘটে না!

আগে যে কোনো সমস্যা মানুষকে নিজে নিজে সমাধান করতে হতো। এখন সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ফলে মানুষের জীবন আগের চেয়ে আরামদায়ক হচ্ছে। আমরা এই শিখন অভিজ্ঞতায় দেখব কীভাবে আমাদের চারপাশে থাকা বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারি।

বিভিন্ন প্রযুক্তির মধ্যে রোবট এখন জনপ্রিয় হচ্ছে। কারণ, রোবট দিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় অনেক সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করা যায়। রোবটকে কাজ করার জন্য নির্দেশনা মানুষই দিয়ে দেয়।

আমরা এর আগে ষষ্ঠ শ্রেণিতে অ্যালগরিদম নিয়ে কাজ করেছিলাম। এবারে আমরা অ্যালগরিদম থেকে প্রবাহচিত্র তৈরি করব, তারপর সেই প্রবাহচিত্র থেকে রোবটের বোঝার উপযোগী সুডো কোডে রূপান্তর করব। সুডো কোড সম্পর্কে আমরা এখনো জানি না, কিন্তু এই শিখন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন করার পর জেনে যাব। আচ্ছা, কেমন হয় যদি আমরা নিজেরাই একেকটি রোবট হয়ে যাই? রোবটের জন্য তৈরি করা সুডো কোডের নির্দেশ কি আমরা নিজেরাও বুঝতে পারব? এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা নিজেরা রোবট সেজে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করব।

সেশন–১: হরেক রকম বাস্তব সমস্যা

যেকোনো সমস্যা যেটা নিজেদের জীবনে মানুষ তার জীবনে সম্মুখীন হয় সেটাই একটি বাস্তব সমস্যা। 'মেঘা' নামের একটি মেয়ে ও তার সহপাঠীরা এরকম একটি বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আসো আমরা মেঘার গল্প থেকে সেটি জেনে নিই–

মেঘা সপ্তম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। একদিন ক্লাসের বিরতির সময় মেঘা উদাস হয়ে বসে কিছু ভাবছিল।

তখন মেঘার বন্ধু জিসান এসে বলল, 'কি রে সবাই গল্প করছে, আর তুই একা বসে বসে কী ভাবছিস?' তখন মেঘা বলল, 'আচ্ছা সবাইকেই জানাব, সবাইকে আমার কাছে আসতে বলো।'

মেঘার সব সহপাঠী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মেঘা কী বলবে শোনার জন্য। তখন মেঘা শুরু করল, আমি আজ ভোরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে সোয়েটার পরে বিদ্যালয়ে আসছিলাম।

তোরা তো জানিস কয়েক দিন ধরে কেমন ঠান্ডা পড়েছে! এমন সময় দেখলাম দু'জন মানুষ, তাদের গায়ে কোনো গরম কাপড় নেই! ঠাণ্ডায় অনেক কষ্ট হচ্ছিল উনাদের। আমাদের আশপাশে কত মানুষ আছে যাদের গরম কাপড় কেনার আর্থিক সামর্থ্য নেই! শীতকালে তারা কত কষ্ট করেন। আমরা কি এই সমস্যা সমাধানে কিছুই করতে পারি না?'

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এই কথা শুনে মেঘার এক বন্ধু রিয়া বলল, ‘এটা তো আমি কখনো ভাবিনি। আমরা তো চাইলে একটা শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি করতে পারি। তাহলে বেশকিছু মানুষ উপকৃত হবে যাদের এমন গরম কাপড় প্রয়োজন।’

মেঘা শুনে খুশি হয়ে বলল, ‘তাহলে তো আমাদের এখন পরিকল্পনা করা উচিত এই কাজটা আমরা কীভাবে করব আর সেখানে আমাদের কী কী চ্যালেঞ্জ থাকবে।’

এবার আরেক বন্ধু হাশেম বলল, ‘সবার আগে চ্যালেঞ্জ হলো আর্থিক। আমাদের বেশকিছু গরম কাপড় জোগাড় করতে হবে। এজন্য আমরা একটা প্রচারণা চালাতে পারি, যেন যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তারা টাকা দিয়ে অথবা তাদের বাসায় থাকা ব্যবহার উপযোগী পুরোনো শীতবস্ত্র দিয়ে আমাদের এই উদ্যোগে সাহায্য করতে পারেন।’

এ কথা শুনে বন্ধু নেহা বলল, ‘দেখ হাশেম আমি তোর সঙ্গে একমত। কিন্তু এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করা। সবার তো আর গরম কাপড় প্রয়োজন হবে না। আমরা ঠিক কাদের এই শীতবস্ত্র বিতরণ করব? অর্থাৎ সমাজের কোন অংশের মানুষের জন্য আমাদের এই কর্মসূচি হবে সেটা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের একটা জরিপ করতে হবে। সেই জরিপ থেকে আমরা বের করব সমাজের কোন মানুষগুলোর গরম কাপড়ের অভাব আছে, তাই এই সমস্যার সমাধানে কাজ করার সময় একটা সামাজিক নির্ভরশীলতাও আছে।’

এবারে মেঘা বলল, ‘আমাদের আরও একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে। যাদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে, তাদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরণের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করতে হবে। আমরা চাইলে আমাদের বিদ্যালয় ব্যবহার করার জন্যও অনুমতি নিতে পারি।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেবার পর যাদের মধ্যে আমরা শীতবস্ত্র বিতরণ করব, তাদের শীতবস্ত্র গ্রহণের সময় ও স্থান জানিয়ে দিতে হবে। এরপর নির্ধারিত দিনে বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।'

এমন সময়ে রায়হান বলল, 'আরও একটা দিক আছে। আমরা যদি বেশকিছু মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করি, কাদের মধ্যে বিতরণ করব, ঠিকমতো তাদের তালিকা করে হিসাব-নিকাশ রাখতে হবে। তালিকা থেকে যেন কেউ বাদ না পড়ে, আবার ভুলে একই ব্যক্তির কাছে দুইবার কাপড় বিতরণ না হয় এসব লক্ষ রাখতে হবে। কাজেই এখানে একটা কারিগরি দিক আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা কাগজে-কলমে লিখে তালিকা নিয়ে কাজ করলে হিসাবে ভুল হতে পারে। তাই আমাদের উচিত একটি স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহার করা, যেখানে আমরা তালিকা এন্ট্রি করে রাখব, কে কে শীতবস্ত্র নিয়ে গেল, কারা এখনো নেয়নি সেটি হিসাব রাখব।'

এবারে প্রিয়া বলল, 'হ্যাঁ আমাদের শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির বেশকিছু দিক আমরা ভেবে ফেলেছি।

তবে যেদিন আমরা বিতরণ করব, সেদিনের আবহাওয়া তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের কথাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা আগে থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে রাখব, যেন সেদিন বৃষ্টির বা অন্য কোনো কিছুর সম্ভাবনা আছে কি না, সেটা জেনে প্রস্তুত থাকতে পারি। মেঘা এবারে বলল, 'বন্ধুরা আমি এখন খুব খুশি। সকালে যেই সমস্যা নিয়ে আমি এত চিন্তিত ছিলাম, সবাই মিলে আলোচনা করে সেটা সমাধান করার জন্য উপায় বের করে ফেলেছি। এখন আমাদের হাতে অনেক কাজ। সবাই মিলে দায়িত্ব ভাগ করে নিই, কে কোন কাজ করবে। আমরা এই কাজে সফল হবই!'

উপরে আমরা মেঘা ও তার বন্ধুদের শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি নিয়ে জানতে পারলাম। ওরা যখন এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, তখন ওদের সমস্যা সমাধানের জন্য পাঁচটি দিক নিয়েও ভাবতে হয়েছে। এগুলো হলো– অর্থনৈতিক, সামাজিক, ব্যবহারিক, কারিগরি ও পরিবেশগত দিক। সত্যি বলতে যে কোনো বাস্তব সমস্যার ক্ষেত্রেই আমরা এরকম বেশকিছু দিক বা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারি। তবে সব বাস্তব সমস্যার ক্ষেত্রেই পাঁচটি দিকই থাকবে এমন কিন্তু নয়! কোনো সমস্যা হয়তো শুধু একটি দিকের উপর নির্ভরশীল, কোনটি হয়তো একাধিক দিকের উপর নির্ভরশীল।

তবে আমরা এখন থেকে যে কোনো সমস্যা নিয়ে কাজ করার সময়ে সেটি এই পাঁচটি দিকের ওপর নির্ভরশীল কি না, সেটি যাচাই করে নেব, তাহলে সমাধান করতেও সুবিধা হবে। এবারে একটি কাজ করি, নতুন একটি সমস্যা নিয়ে ভাবি। ধরি, নতুন একটি অপরিচিত জায়গায় আমরা ঘুরতে যাব। এক্ষেত্রে কোন কোন দিকের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কাজ করবে? আর সেই দিকগুলোয় ঠিক কী রকম নির্ভরশীলতা আসবে? সেটি নিচের ছকে লিখে ফেলি–

সমস্যার নাম–অপরিচিত নতুন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া					
নির্ভরশীলতার দিক	অর্থনৈতিক	সামাজিক	ব্যবহারিক	কারিগরি	পরিবেশগত

সেশন–২: সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তির ব্যবহার

বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার মানব সভ্যতার জন্য একটি আশীর্বাদ। সমস্যা সমাধানে সঠিক সময়ে সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত। আমাদের চারপাশে এমন অনেক সমস্যা আছে যেগুলো মানুষ আগে নিজে সমাধান করতো, কিন্তু এখন প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে সেটি সমাধান করা অনেক সহজ হয়ে গেছে। গত সেশনে আমরা অপরিচিত নতুন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া নিয়ে ভেবেছি। অতীতে অপরিচিত জায়গায় ঘুরতে গেলে অবশ্যই আগে ঐ জায়গায় গিয়েছে এমন কারও থেকে সেই জায়গার ব্যাপারে ধারণা নিতে হতো। তার থেকে জেনে নিতে হতো কীভাবে আমরা সেই জায়গায় যেতে পারি, সেখানে যেতে কত সময় লাগবে, কোন রাস্তার পর কোন রাস্তায় যেতে হবে ইত্যাদি।

তবে এখন এক্ষেত্রে সহজ সমাধান হলো কোনো ম্যাপ সফটওয়্যার ব্যবহার করা। এই ধরনের সফটওয়্যারে আমরা কোথায় আছি এবং গন্তব্য কোথায় সেটি লিখে দিলে আমাদের দেখিয়ে দেয় কত সময়ের মধ্যে কীভাবে আমরা পৌঁছাতে পারব,

রাস্তায় কতটুকু যানজট আছে, কোন রাস্তা দিয়ে গেলে যেতে সুবিধা হবে, কোন যানবাহনে গেলে যেতে কত সময় লাগবে ইত্যাদি আরও কত কী!

আবার একই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তির উদ্ভাবনও হয়ে থাকে! যেমন ম্যাপ সফটওয়্যার দিয়ে আমরা শুধু জানতে পারছি নির্দিষ্ট জায়গায় কীভাবে যাব। কিন্তু আমরা যদি একটি যানবাহন বুকিং করতে চাই, যেই যানবাহন দিয়ে সরাসরি নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে পারব, তাহলে বিভিন্ন যানবাহন বুকিং সফটওয়্যার/অ্যাপ ব্যবহার করতে পারি। এসব সফটওয়্যারে নির্দিষ্ট যানবাহন বুকিং করা যায়, কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে কত টাকা খরচ হবে সেই যানবাহনে সেটিও আমাদের দেখিয়ে দেয়। অর্থাৎ ম্যাপ সফটওয়্যার থেকেও আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি। ফলে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাবার সমস্যাটি পুরোপুরি সমাধান হয়ে যাচ্ছে, আর কোনো চিন্তাই করতে হচ্ছে না! একইভাবে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট/অ্যাপ থেকে ট্রেন বা বাস বা উড়োজাহাজের টিকিট কাটার কাজও এখন সহজেই করা যায়।

আবার করোনা অতিমারির কারণে একটি নির্দিষ্ট সময়জুড়ে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখার প্রয়োজন হয়েছিল সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে। এই সময়ে প্রযুক্তির কল্যাণেই বিভিন্ন সফটওয়্যার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যুক্ত হয়ে অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করে।

কথায় আছে ‘প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক।’

করোনা অতিমারির পূর্বে বিভিন্ন অনলাইন সভা করার সফটওয়্যারের চাহিদা তেমন ছিল না। কিন্তু করোনা অতিমারির সময় প্রায় সারা পৃথিবীর মানুষই ঘরে অবরুদ্ধ ছিল। তাই এই সময় জুম, গুগল মিট, মাইক্রোসফট টিম ইত্যাদি অনলাইন মিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে অনলাইন ক্লাস, ব্যবসায়িক মিটিং ইত্যাদির আয়োজন করার প্রয়োজন হয়। যদি এই প্রযুক্তি একটি বিকল্প হিসেবে না আসত, তাহলে হয়তো করোনার সময়ে সারা পৃথিবীর অনেক কার্যক্রম স্থবির হয়ে যেত। কাজেই এক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি মানুষকে অগণিত কাজে সাহায্য করেছে।

আবার অনেক সময় একটি সমস্যা সমাধানে কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পরেও দেখা যায় সমস্যাটি সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি বা সমাধানে কোনো ঘাটতি রয়ে গেছে। তখন সেই প্রযুক্তিকে হালনাগাদ বা আপগ্রেড করার প্রয়োজন হয়। যেমন আর্থিক লেনদেনের কথা ভাবি। আগে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া ছিল বেশ জটিল । মানি অর্ডার করে কারও কাছে টাকা পাঠালে তার কাছে টাকা পৌঁছাতে অনেক সময় লাগত।

বর্তমানে মোবাইলের সাহায্যে নির্দিষ্ট টাকা লেনদেনের প্লাটফরমের মাধ্যমে নিমেষেই দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা পাঠানো যায়। তবে প্রথম যখন এই ধরনের টাকা লেনদেনের সার্ভিস চালু হয়েছিল, তখন একটি সমস্যা হতো। ধরো আমরা আমাদের ৫০০ টাকা নিজের অ্যাকাউন্ট থেকেই উত্তোলন করব। এ জন্য টাকা লেনদেনের নির্দিষ্ট এজেন্টের কাছে গিয়ে সেই এজেন্টের মোবাইল ফোন নাম্বারে প্রথমে আমাদের টাকা ক্যাশ আউটের জন্য পাঠাতে হবে।

এজেন্ট টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে বুঝে পেলে আমাদের টাকা দিয়ে দেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যদি এজেন্টের মোবাইল ফোন নাম্বার টাইপ করার সময়ে আমরা কোনো ভুল করে ফেলি, তাহলে ঐ এজেন্টের কাছে টাকা না গিয়ে অন্য কোনো নাম্বারে টাকা চলে যাবে। এতে আমাদের আর্থিক ক্ষতি হবে। প্রথমদিকে মানুষ বিভিন্ন সময় এভাবেই ভুল নম্বরে টাকা পাঠিয়ে বিপদে পড়ত।

এই সমস্যাকেও কিন্তু আবার প্রযুক্তির সাহায্যেই সমাধান করা হয়েছে! এখন যে কোনো মোবাইল নাম্বারে টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে এজেন্টের দোকানে একটি কিউআর কোড (QR Code) দেওয়া থাকে। মোবাইল সেটে থাকা টাকা পাঠানোর অ্যাপলিকেশনে এই কিউআর কোড স্ক্যান করার সুবিধা থাকে। ফলে এজেন্টের নাম্বার ভুল টাইপ করার ভয় থাকে না। কিউআর কোড স্ক্যান করার পর সঠিক নাম্বারে টাকা পাঠানো নিশ্চিত হয়।

আবার কাউকে শুধু টাকা পাঠানো বা নিজে টাকা পাবার ক্ষেত্রে এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যবহার করা যায় তা কিন্তু নয়! এগুলো দিয়ে বাসাবাড়ির বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি সংযোগের বিল প্রদান করা যায়, ফলে নির্দিষ্ট অফিসে গিয়ে লাইন ধরে বিল প্রদান করার ঝামেলা কমে গেছে। একটি প্রযুক্তি প্রথমে হয়তো নির্দিষ্ট একটি সমস্যার সমাধানের জন্যই উদ্ভাবন করা হয়, কিন্তু পরে একই প্রযুক্তি আরও বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগানো যায়!

উপরে আমরা যেমন বেশকিছু সফটওয়্যার প্রযুক্তির কথা জানলাম, তেমনি বিভিন্ন রোবট দিয়েও এখন বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। যেমন–বিভিন্ন স্থানে যখন আগুন লাগে, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ও সেখান থেকে আটকে পড়া বিভিন্ন মানুষকে উদ্ধার করতে দমকল বাহিনীর সময় লাগে। পাশাপাশি আটকে পড়া মানুষ উদ্ধারের জন্য দমকল বাহিনীর যেসব কর্মী আগুন লাগা ভবনের ভিতরে প্রবেশ করেন, তাদের জীবনেরও ঝুঁকি থাকে। এরকম ক্ষেত্রে দমকল বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন ফায়ার ফাইটার রোবট ব্যবহার করা যায়।

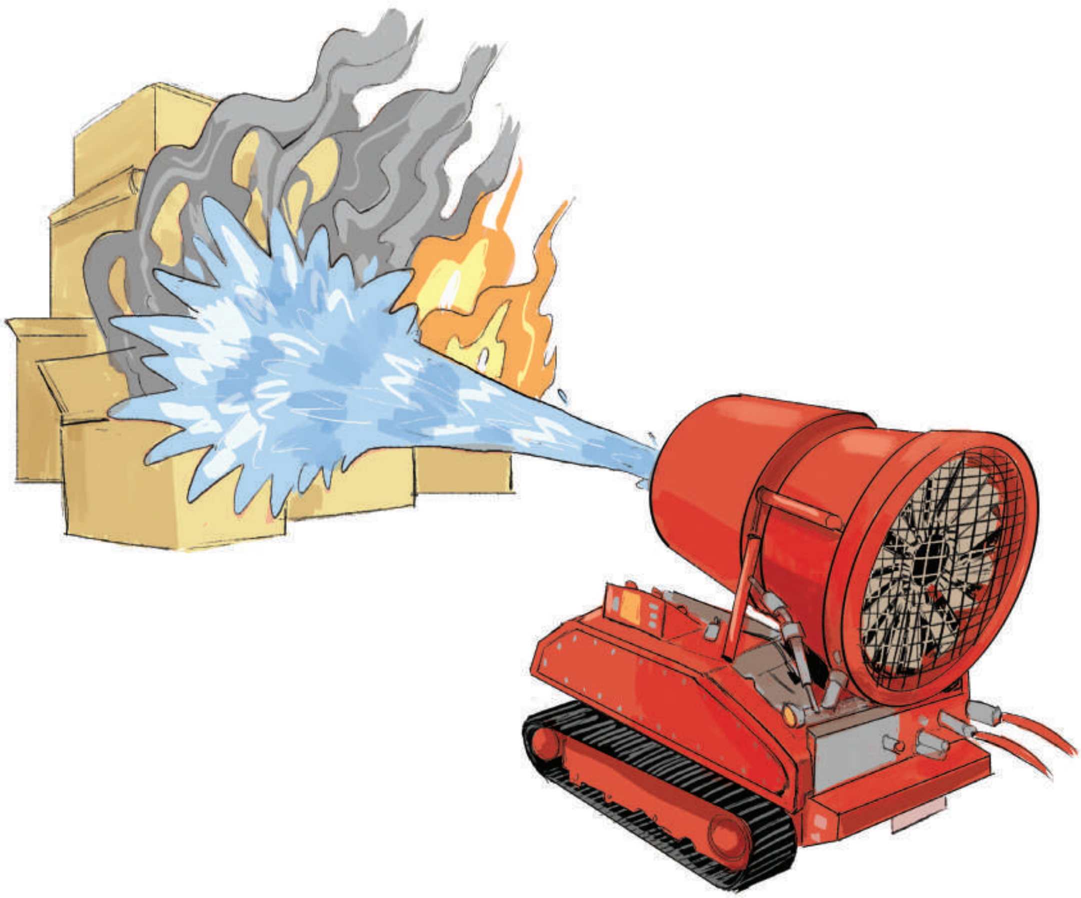

২০২২ সালে সীতাকুণ্ডে লাগা আগুন নেভানোর কাজে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বাহিনী প্রথমবারের মতো রোবট ব্যবহার করে। এরকম আরও বিভিন্ন রোবটবিষয়ক প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে যে কোনো সমস্যার জন্যই আমরা প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সমাধানের উপায় বের করতে পারি।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

বাসায় গিয়ে আমরা কিছু বাস্তব সমস্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব, যে সমস্যাগুলো বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাধান করা সম্ভব। বিশেষ করে কোনো নির্দিষ্ট রোবট দিয়ে সমাধান করা যাবে এমন সমস্যাগুলো তুমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পার।

এমন পাঁচটি সমস্যার কথা নিচের ছকে লিখে ফেলি–

১.

২.

৩.

৪.

৫.

সেশন–৩: সমস্যা সমাধানের অ্যালগরিদম বানাই

আমরা বাসায় গিয়ে বেশকিছু সমস্যার তালিকা তৈরি করেছিলাম যে সমস্যাগুলো প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। এবারে আমরা একটি সমস্যা নির্বাচন করে সেটি সমাধানের ধাপগুলো অর্থাৎ অ্যালগরিদম লিখব। তার আগে নিচের কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে–

১. শিক্ষক পুরো ক্লাসের সবাইকে নিয়ে মোট ছয়টি ভিন্ন দলে ভাগ করে দেবেন।

২. প্রতিটি দলের সকল সদস্য নিজেদের লেখা বিভিন্ন সমস্যা যেগুলো প্রযুক্তি দিয়ে (বিশেষ করে কোনো রোবট দিয়ে) সমাধান করা যায় সেগুলোর তালিকা একসঙ্গে করবে।

৩. এবারে নিজেরা মিলে আলোচনা করে একটি সমস্যা বাছাই করার সিদ্ধান্ত নেবে । এই সমস্যা নিয়েই পরবর্তী সেশনগুলোতে আমরা কাজ করব।

৪. সমস্যা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দলের একাধিক শিক্ষার্থীর তালিকায় ছিল সেটিকে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে।

৫. এবারে নির্বাচন করা সমস্যা সমাধানের ধাপগুলো অর্থাৎ অ্যালগরিদম আলোচনা করে লিখে ফেলি। মনে রাখতে হবে, অ্যালগরিদম এমনভাবে লিখতে হবে যেন একটি রোবটকে সেই অ্যালগরিদম দিলে অ্যালগরিদমের ধাপগুলো অনুসরণ করে রোবটটি পুরো কাজটি করে ফেলতে পারে।

যেমন, আমরা এর আগে আগুন নেভানোর জন্য রোবটের ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছিলাম। তুমি যদি আগুন নেভানোর একটি রোবট হতে তাহলে তোমার কাজ করার অ্যালগরিদম কেমন হতো?

এক্ষেত্রে আমাদের অ্যালগরিদম হবে পরের পৃষ্ঠার মতো–

সমস্যা–আগুন নেভানোর জন্য রোবট ব্যবহার করা

অ্যালগরিদম–

১ম ধাপ - প্রথমে রোবটটি চালু করি;

২য় ধাপ - রোবটের ক্যামেরা দিয়ে সামনের অবস্থা দেখি;

৩য় ধাপ - যদি দেখি কোথাও আগুন দেখা যাচ্ছে না তাহলে ৪র্থ ধাপে চলে যাই। আর যদি দেখি সামনে আগুন দেখা যাচ্ছে, তাহলে রোবটের পাইপ দিয়ে পানিপ্রবাহ করি, আগুন না নেভা পর্যন্ত পানি ঢালতে থাকি;

৪র্থ ধাপ –কাজ শেষ।

এবারে নিজেদের দলের নির্বাচন করা সমস্যার বিষয়বস্তু ও সমাধানের অ্যালগরিদম লিখে ফেলি–

সমস্যা

অ্যালগরিদম–

সেশন–৪: চলো প্রবাহচিত্র বানাই

ইতোপূর্বে আমরা প্রবাহচিত্র (Flow Chart) তৈরি করা দেখেছিলাম। তবে সেগুলো ছিল খুবই সরল প্রবাহচিত্র। কোনো যন্ত্রকে প্রোগ্রাম করার বা নির্দেশনা বুঝিয়ে দেবার জন্য মূলত দুটি ধাপ আছে। প্রথমে প্রবাহচিত্র তৈরি করা হয়, যেন আমাদের নির্দেশনাগুলো যন্ত্রের বোঝার উপযোগী হয়, এরপর সেই প্রবাহচিত্র অনুযায়ী প্রোগ্রাম লিখতে হয়।

প্রবাহচিত্র আঁকার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ছবি দেখেই একনজরে পুরো নির্দেশনার ধাপগুলো সহজে বোঝা যায়। ফলে যন্ত্রকে পুরো নির্দেশনা বোঝানো সহজ হয়।

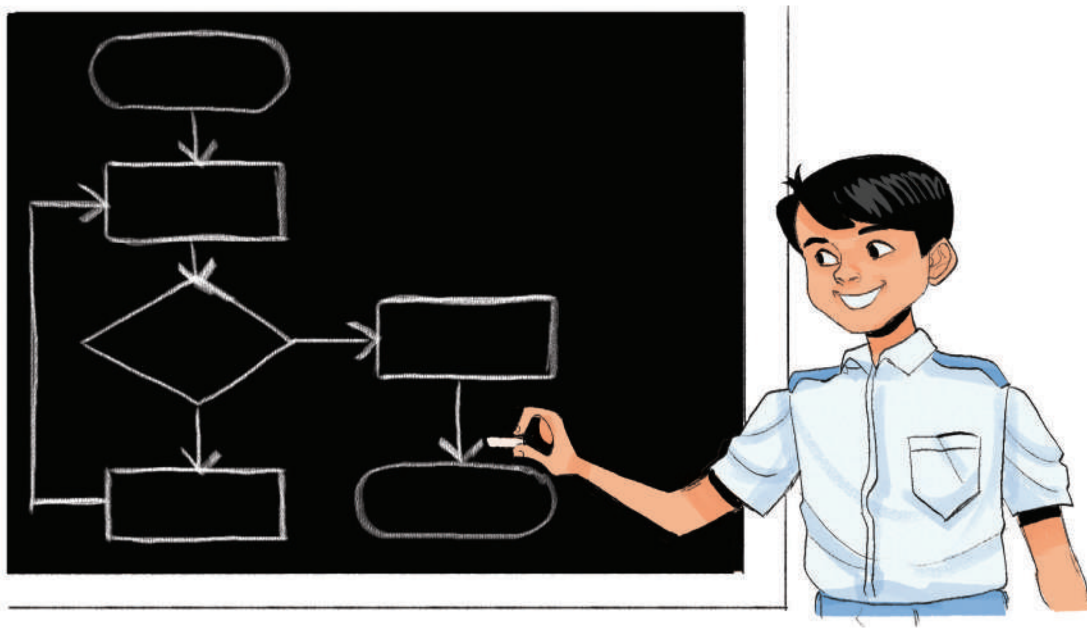

আবার যদি নির্দেশনার ধাপে কোনো ভুল থাকে, সেটি সব সময় অ্যালগরিদম থেকে সহজে শনাক্ত করা যায় না। কিন্তু সেই তুলনায় প্রবাহচিত্র থেকে সহজে এরকম ভুল বের করা যায়; পুরো নির্দেশনার কোন অংশে কী ভুল হচ্ছে তা বোঝা যায়।

আবার নির্দেশনায় কোনো পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রেও প্রবাহচিত্র ব্যবহার করলে পরিবর্তন আনা সহজ হয়। তবে প্রবাহচিত্রেও কোন কোন সময় সমস্যা হয় না তা কিন্তু নয়।

আমাদের তৈরি করা নির্দেশনার ধাপ যদি অনেক বেশি জটিল হয়, তাহলে পুরো নির্দেশনা প্রবাহচিত্রে উপস্থাপন করা বেশ কঠিন হয়ে যাবে। এজন্য নির্দেশনার ধাপ অনেক বেশি জটিল হলে তখন প্রবাহচিত্র ব্যবহার সব সময় সম্ভব হয় না।

আমরা পূর্বে যে সরল প্রবাহচিত্রগুলো দেখেছিলাম, সেখানে মূলত তীর চিহ্ন দিয়ে পুরো নির্দেশনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সরলরৈখিকভাবে বিভিন্ন নির্দেশনা দেখানো হয়েছিল; যা একটি অ্যালগরিদম থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়।

কিন্তু একটি প্রবাহচিত্রে শুরু ও শেষের মাঝে বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট তথ্য ইনপুট বা আউটপুট দিতে হতে পারে, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হতে পারে বা অন্য কোনো কাজ সম্পাদন করা প্রয়োজন হতে পারে।

ইনপুট আর আউটপুট শব্দ দুটি তুমি কি কখনো শুনেছ? ইনপুট মানে হলো বাইরে থেকে কোনো তথ্য গ্রহণ করা। যেমন ধরি আমি চোখ দিয়ে একটা সাদা বিড়াল দেখতে পাচ্ছি। বিড়াল কিন্তু আমার চোখের বাইরে ছিল। বিড়ালটির রং কী সেই তথ্য আমার চোখ গ্রহণ করেছে। বিড়ালের রং সাদা–এই তথ্যটি হলো চোখের ইনপুট।

আবার বাইরের জগতে কোনো কাজ করে দেখালে সেটা হলো আউটপুট। যেমন–তুমি যখন মুখ দিয়ে কথা বলো, মুখ থেকে শব্দ তৈরি হয়ে বাইরে যায়। এই যে শব্দ বা তথ্য বাইরে গেল মুখ থেকে, এই তথ্যটি হলো মুখের আউটপুট।

আমরা যন্ত্রের বোঝার উপযোগী যে প্রবাহচিত্রটি তৈরি করব, সেটিতে বেশকিছু প্রতীক আমাদের ব্যবহার করতে হবে–

প্রতীক	অর্থ	বিস্তারিত
	শুরু/শেষ	একটি কাজের শুরু বা শেষ বোঝাতে এই প্রতীক ব্যবহার করা হয়।
	প্রসেস	সাধারণ কোনো প্রসেস বা ধাপ দেখানোর সময় এই প্রতীক ব্যবহার করা হয়।
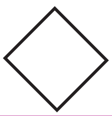	সিদ্ধান্ত	যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার সময় এই প্রতীক ব্যবহার করা হয়।
	ইনপুট/ আউটপুট	কোনো ডাটা ইনপুট নেবার জন্য বা আউটপুট প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়।
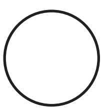	সংযোগকারী	প্রবাহচিত্রে এক ধাপের সঙ্গে অন্য ধাপকে একসঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন হলে এই প্রতীক ব্যবহার করা হয়।
	প্রবাহের দিক	দিক চিহ্ন দিয়ে একটি ধাপের পর কোন ধাপ অনুসরণ হচ্ছে সেটি বোঝা যায়।

এর বাইরেও আরও বিভিন্ন প্রতীক আছে প্রবাহচিত্র আঁকার জন্য। সেগুলো পরবর্তী শ্রেণিসমূহে প্রয়োজন হলে তখন আমরা শিখে নেব।

এখন আবার আগের সেশনে শিখে আসা রোবট দিয়ে আগুন নেভানোর অ্যালগরিদমের কথা ভাবি।

তুমি যদি নিজে একটি আগুন নেভানোর রোবট হতে, তাহলে আগে তৈরি করা অ্যালগরিদমকে আমরা প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করলে দেখতে কেমন হবে?

সমস্যা–আগুন নেভানোর জন্য রোবট ব্যবহার করা

প্রবাহচিত্র –

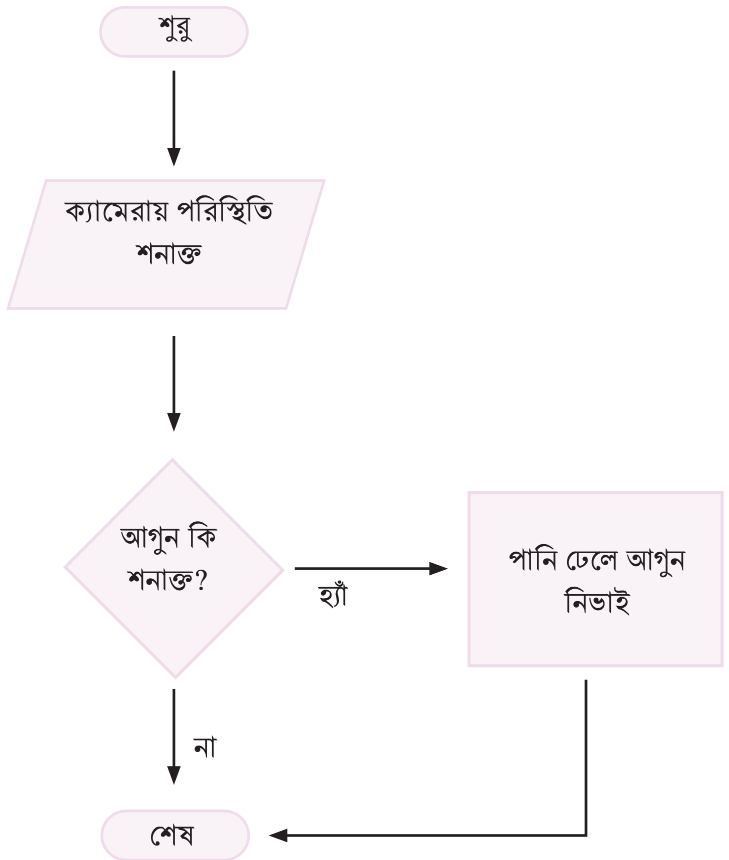

সেশন–৫ : নিজেদের তৈরি অ্যালগরিদমকে প্রবাহচিত্রে রূপান্তর

আমরা এর আগে দেখেছি কীভাবে অ্যালগরিদম থেকে সহজেই প্রবাহচিত্র তৈরি করা যায়। প্রবাহচিত্রে অ্যালগরিদমের মতো এত বিস্তারিত নির্দেশনা লেখার প্রয়োজন হয়নি। বরং আমরা যে বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করছি তার মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে কোন ধাপে কোন কাজ হচ্ছে। এবারে আমরা নিজেরা দলগতভাবে যে সমস্যা নির্ধারণ করেছিলাম, সেই সমস্যা থেকে তৈরি করা অ্যালগরিদমকে প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করব।

আমাদের তৈরি করা অ্যালগরিদমে নিশ্চয়ই বেশ কিছু ধাপ আছে। কাজের সুবিধার্থে প্রথমে আমরা নির্ধারণ করে নিই কোন কোন ধাপে আমরা ইনপুট নিয়েছি বা আউটপুট দিয়েছি, কোন কোন ধাপে কী রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ও কোন কোন ধাপে শুধু সাধারণ তথ্য প্রসেস করা হয়েছে।

এরপর সেই অনুযায়ী আমরা প্রবাহচিত্র আঁকব–

সমস্যা
বিভিন্ন ইনপুট/আউটপুট–
বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ধাপ–

বিভিন্ন সাধারণ কাজ–

আমাদের প্রবাহচিত্র–

সেশন–৬: যন্ত্র বুঝুক কথা

আগের সেশনে আমরা নিজেদের সমস্যার সমাধান নিয়ে প্রবাহচিত্র তৈরি করেছি। তবে কোনো যন্ত্রকে সরাসরি আসলে প্রবাহচিত্র ধরিয়ে দেওয়া হয় না। যন্ত্রকে নির্দিষ্ট কোন প্রোগ্রাম অথবা কোড লিখে দিতে হয় যেখানে যন্ত্রের বোঝার উপযোগী করে কাজের ধাপগুলো লেখা থাকে।

এই যে, যন্ত্রের বোঝার জন্য নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বা কোড আমরা তৈরি করব, সেটি প্রবাহচিত্র অনুসরণ করেই করব। তবে চাইলে সরাসরি অ্যালগরিদম থেকেও কোড তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু যন্ত্র আমাদের নির্দেশ বোঝে কীভাবে? প্রথমত, একটি যন্ত্র (কম্পিউটার, রোবট ইত্যাদি) আসলে সরাসরি আমাদের মুখের ভাষা বুঝতে পারে না। সেটি ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদি যে ভাষায়ই হোক না কেন! যন্ত্র শুধু বোঝে ০ আর ১ এই দুটি সংখ্যা। এই দুটিকে বলা হয় বাইনারি ডিজিট।

এই ০ ও ১ বাইনারি সংখ্যার মাধ্যমেই যন্ত্র সব নির্দেশনা বোঝে। যেমন আমাদের বাংলা ভাষায় ৫০টি বর্ণ, সেই ৫০টি বর্ণ দিয়ে আমাদের বোঝার উপযোগী অগণিত শব্দ ও বাক্য তৈরি হয়। তেমনি যন্ত্রের বোঝার মতো সকল নির্দেশনা তৈরি হয় শুধু ১ ও ০ দিয়ে! ০ আর ১ এর সমন্বয়ে গঠিত এসব নির্দেশ বা কোডকে বলা হয় মেশিন কোড। কিন্তু আমরা তো মেশিন কোড বুঝি না। অনেকগুলো ০ আর ১-কে একসঙ্গে দেখলে আমাদের কাছে শুধু হিজিবিজি মনে হবে। তাহলে আমরা কীভাবে যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করব? সেটার জন্য আছে বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষা, যেমন–সি, পাইথন, পার্ল, জাভা, স্ক্র্যাচ ইত্যাদি।

সাধারণত একটা প্রোগ্রামিং ভাষায় কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে মানুষের বোঝার উপযোগী (যেমন–ইংরেজি বা বাংলা ইত্যাদি) ভাষায় এমন করে নির্দেশনা লেখা হয় যেটা যন্ত্র বুঝতে পারে। এরপর সেই নির্দেশ যন্ত্রের কাছে পাঠানো হলে যন্ত্র সেটিকে খুব সহজে মেশিন কোডে রূপান্তর করে নেয় ও নির্দেশ অনুসরণ করে কাজ করে। প্রশ্ন আসতে পারে কোন প্রোগ্রামিং ভাষাটি শিখব?

আসলে যে কোনো একটি প্রোগ্রামিং ভাষা শিখে যন্ত্রকে নির্দেশ দেওয়া শুরু করা যেতে পারে। একটি শেখা গেলে তারপর অন্যগুলো শেখাও অনেক সহজ হয়ে যাবে আমাদের জন্য। আমরা এখনই সরাসরি নির্দিষ্ট কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা শিখতে যাচ্ছি না। তার পরিবর্তে যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় সহজে রূপান্তর করা যাবে এমন সুডো কোড (pseudo code) আমরা তৈরি করা শিখব।

সুডো কোড জিনিসটা কী? সুডো মানে হলো অনুরূপ বা ছদ্ম।

মূলত সুডো কোড হচ্ছে অ্যালগরিদমকে মানুষের বোঝার উপযোগী ভাষায় এমনভাবে সংকেত বা কোড আকারে প্রকাশ করা, যেটি থেকে সহজেই যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় পুরো নির্দেশমালাকে রূপান্তর করা যাবে।

তবে খেয়াল রাখতে হবে সুডো কোড কিন্তু সত্যিকারের একটি প্রোগ্রাম নয়। তাই কোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় না লিখে শুধু সুডো কোড লিখে দিলে যন্ত্র সেটি বুঝতে পারবে না। সুডো কোডে বর্ণিত তথ্য যে কোনো সময়ে যে কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা দিয়ে বাস্তবায়ন করা যায়, এটাই সবচেয়ে বড় সুবিধা।

আমরা যদি আমাদের রোবট দিয়ে আগুন নিভানোর প্রবাহচিত্রকে সুডো কোডে রূপান্তর করতে যাই, তাহলে কিছু জিনিস ভেবে নিতে হবে।

প্রথমত, সকল ইনপুট বা আউটপুটকে নির্দিষ্ট চলক (ক, খ, গ ইত্যাদি) দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। আবার কোনো সিদ্ধান্ত নেবার সময় 'যদি' ও 'অন্যথায়' দিয়ে প্রকাশ করব।

আর কোনো কাজ সম্পন্ন করার সময় (যেমন–আগুন নিভাচ্ছি) সেটাকে একটা ফাংশন হিসেবে () চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করব।

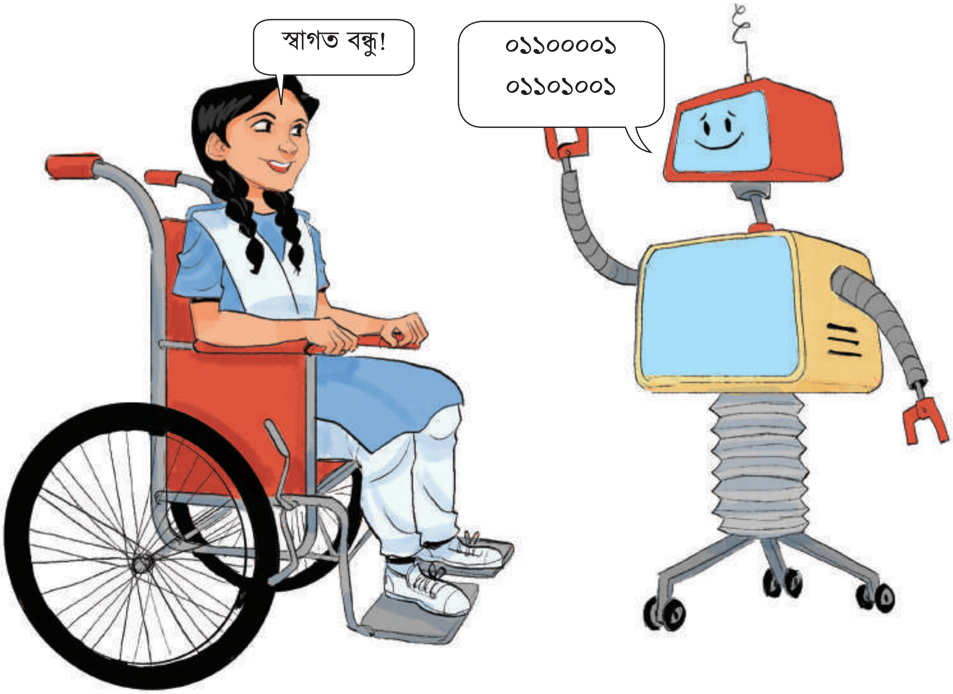

ফাংশন মানে হলো নির্দিষ্ট কিছু ধাপ অনুসরণ করে নির্ধারিত একটি কাজ শেষ করা।

যেমন–আগুন নিভানোর ফাংশন হতে পারে আগুন নিভাই ()

সুডো কোডটি দেখতে এমন হবে–

শুরু

ক = ক্যামেরায় পরিস্থিতি শনাক্তকরণ

যদি ক = হ্যাঁ হয়, আগুন নিভাই () এরপর শেষ

অন্যথায় শেষ

তাহলে কত সহজে একটি সুডো কোড দিয়ে আমরা পুরো কাজটি দেখিয়ে দিলাম!

এবারে আমরা একইভাবে নিজেদের দলের তৈরি করা প্রবাহচিত্রকে সুডো কোডে রূপান্তর করে ফেলি–

সেশন–৭: কাগজ দিয়ে রোবট বানাই

আমরা এই শিখনফলে একটি বাস্তব সমস্যা নিয়ে কাজ করা শুরু করে সেটিকে সমাধানের জন্য অ্যালগরিদম তৈরি করেছি, প্রবাহচিত্র তৈরি করেছি ও সুডো কোড তৈরি করেছি। কিন্তু সুডো কোড তৈরি করলাম কার জন্য? একটি যন্ত্রকে দিয়ে সমস্যার সমাধান করার জন্যই তো, তাই না?

তাহলে একটা যন্ত্র বা রোবট না বানালে কীভাবে চলে! এবারে আমরা একটি রোবট তৈরি করব কাগজ কেটে। আর এজন্য আমরা ব্যবহার করব প্রবাহচিত্রের বিভিন্ন প্রতীককে। এজন্য নিচে একটি প্রবাহচিত্র তৈরি করাই আছে। সেটিকে অনুসরণ করে আমরা এই রোবট তৈরি করব!

প্রয়োজনীয় উপকরণ– কাঁচি ও আঠা।

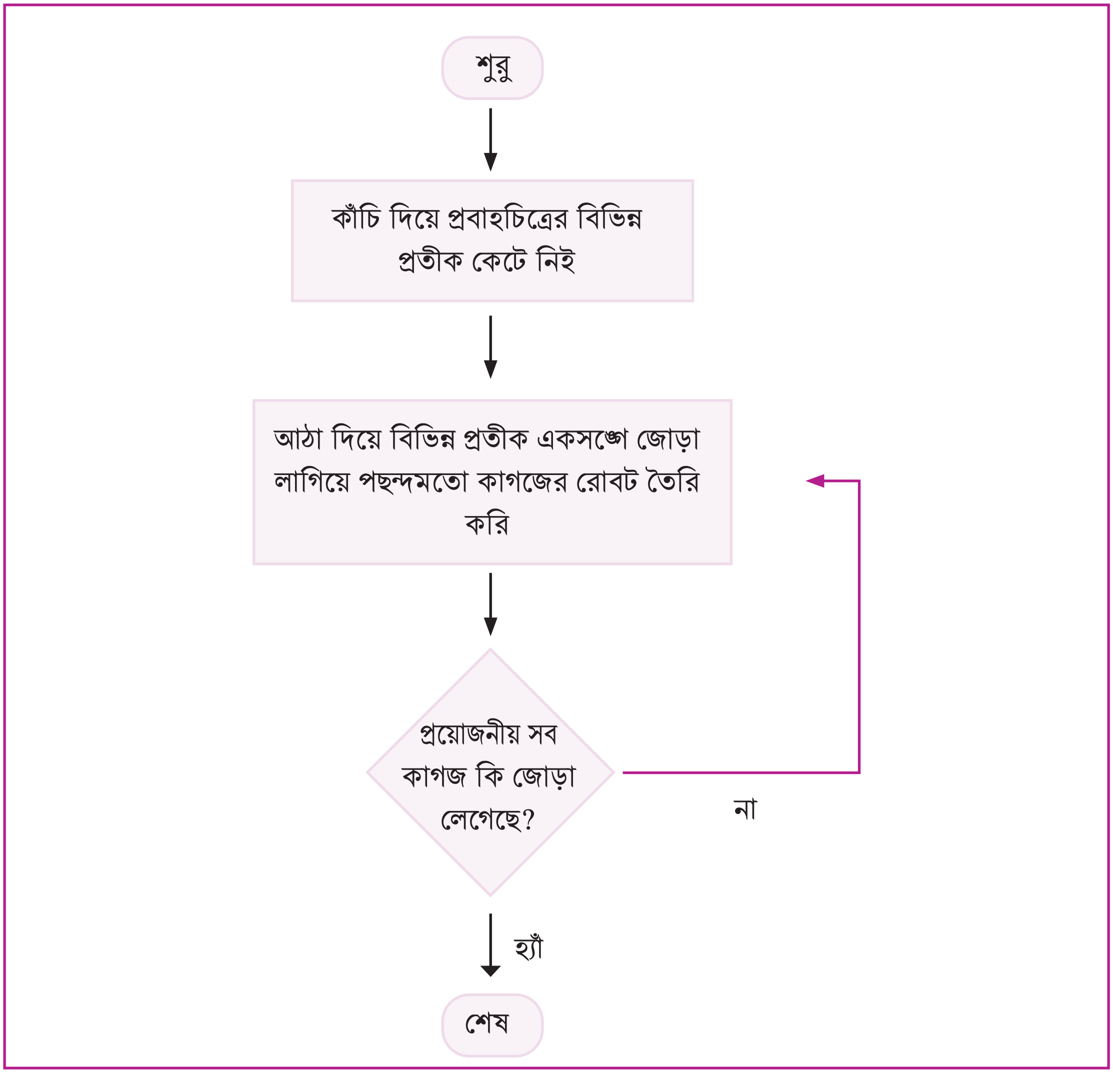

আশা করি, প্রবাহচিত্র দেখেই বুঝতে পারছ কীভাবে আমাদের কাগজের রোবট তৈরি করতে হবে। এখানে একই প্রতীক একাধিক দেওয়া আছে। পছন্দমতো যে প্রতীক যতগুলো খুশি ব্যবহার করে দলগতভাবে নিজেদের

পছন্দমতো কাগজের রোবট তৈরি করে ফেলো।

মজার জিনিস হচ্ছে আমরা নিজেরা এই কাজটা করছি, তাই এই প্রবাহচিত্রে দেয়া নির্দেশনা অনুসরণ করে পছন্দমতো প্রতীক কেটে কাগজের রোবট তৈরি করে নিচ্ছি। তবে কম্পিউটার নিজে এমনভাবে পছন্দমতো প্রতীক আলাদা করে নিতে পারত না। এটি করার জন্য কম্পিউটারকে আগে থেকে শিখিয়ে নিতে হয় কোনটা কী প্রতীক ও দেখতে কেমন।

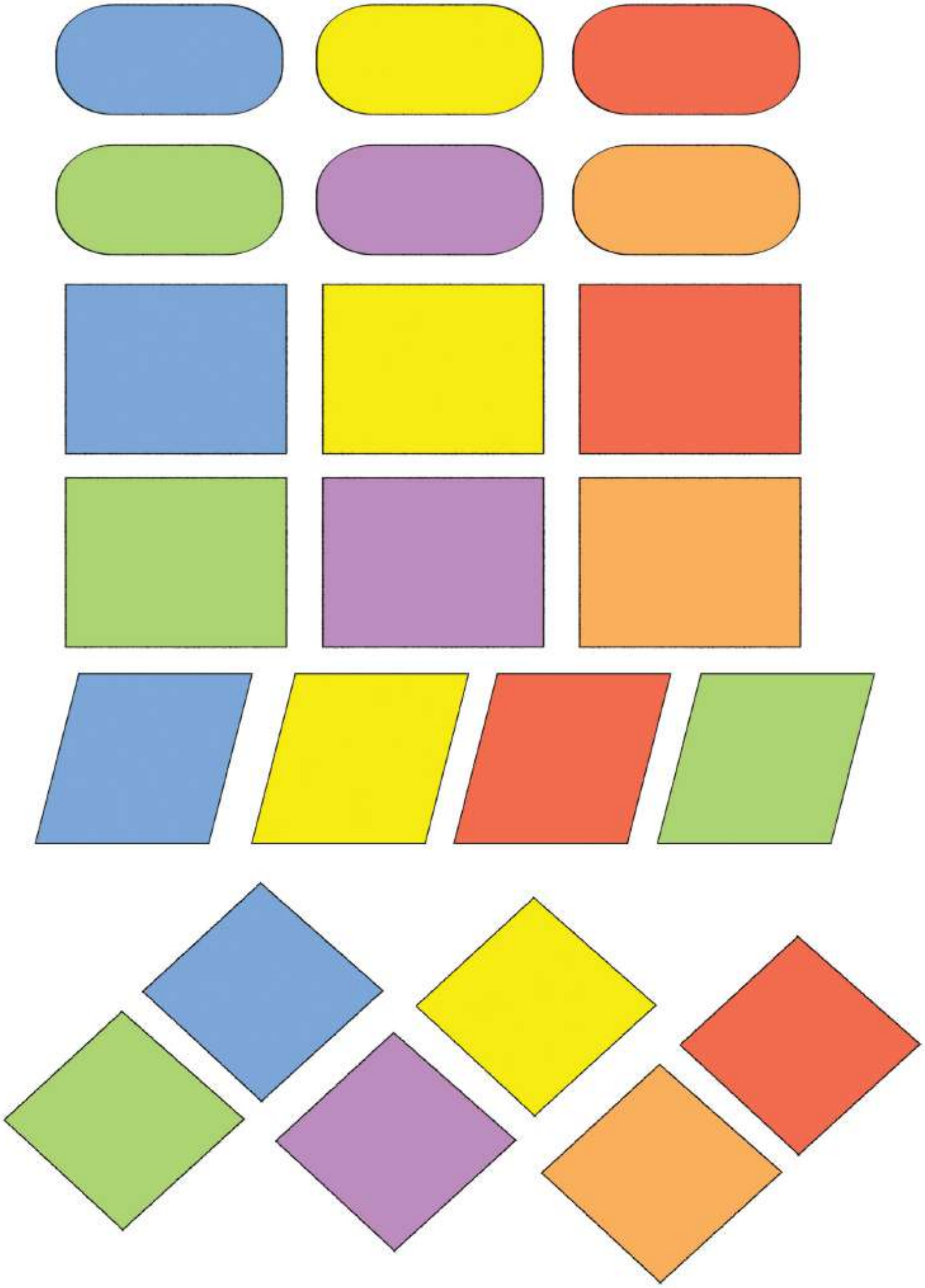

আগের পাতার প্রতীকগুলো কেটে নিজেদের মত রোবট বানাই

সেশন–৮: রোবটে সুডো কোড চালাই

গত দুটি সেশনে প্রবাহচিত্র অনুসরণ করে আমরা নিজেদের নির্বাচন করা সমস্যার সমাধান থেকে সুডো কোড তৈরি করেছি এবং পাশাপাশি একটি কাগজের রোবট তৈরি করেছি।

কিন্তু আমাদের তৈরি করা সুডো কোড ঠিক আছে কি না বা সেটি আসলেই রোবটের বোধগম্য হয়েছে কি না, সেটি তো যাচাই করতে হবে!

তাই এবারে আমরা রোবটে সুডো কোড চালানোর জন্য একটি খেলা খেলব। প্রথমেই আমরা এই খেলার নিয়ম জেনে নিই–

১. দুটি করে দল পরস্পর মুখোমুখি হবে। তাদের হাতে নিজেদের তৈরি করা সুডো কোড ও নিজেদের দলের কাগজের রোবট থাকবে।

২. এবারে শুরু হবে মজার খেলা।

একটি দল তাদের তৈরি সুডো কোড অন্য দলটির কাছে হস্তান্তর করবে। পাশাপাশি কোন সমস্যার সমাধানের জন্য সুডো কোডটি তৈরি করা হয়েছিল সেটিও কাগজে লিখে দেবে।

৩. অন্য দল থেকে আসা সুডো কোড পাবার পর আমরা রোবটের অভিনয় করব। নিজেকে রোবট হিসেবে চিন্তা করব।

৪. আমি যদি রোবট হতাম, তাহলে আমার কাছে থাকা বর্তমান সুডো কোড অনুসরণ করে কি নির্ধারিত সেই সমস্যা আসলেই সমাধান করতে পারতাম?

আমরা সেটি যাচাই করে দেখব।

৫. সুডো কোডে দেওয়া প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করে কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারলে নিচের ছক পূরণ করে ফেলব–

প্রশ্ন	যাচাই (হ্যাঁ বা না লিখি)
পুরো সুডো কোড কি বুঝতে পেরেছি?	
সুডো কোড অনুসরণ করে পুরো কাজ কি করা গেছে?	
সুডো কোডে কোনো নির্দিষ্ট ইনপুট বা আউটপুট কি পেয়েছি?	
সুডো কোডে কোথাও কি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে?	
আমাদের কি মনে হয় এর চেয়ে আরও কম ধাপে পুরো সুডো কোড সম্পন্ন করা যেত?	

সুডো কোডে এমন কোনো ধাপ কি বাদ পড়েছে যেটা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল?	

৬. এই ছকের অধিকাংশ ধাপের উত্তর যদি সন্তোষজনক হয়, তাহলে অন্য দলটিকে অভিনন্দন জানাই। আর আমাদের দলের তৈরি করা কাগজের রোবট উপহার হিসেবে অন্য দলটিকে প্রদান করি।

সব দলই যদি সফলভাবে সুডো কোড সম্পন্ন করে থাকে তাহলে প্রতিটি দলই নিজের দলের তৈরি করা কাগজের রোবটের পরিবর্তে নতুন একটি কাগজের রোবট উপহার পাবে!

কী, দারুণ না!

এভাবে আমরা কিন্তু যেকোনো বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্যই প্রযুক্তির সাহায্য নিতে প্রয়োজনীয় অ্যালগরিদম, প্রবাহচিত্র ও সুডো কোড তৈরি করতে পারি।

প্রয়োজনে যেকোনো সময় শিক্ষকের পরামর্শও নিতে পারি এই কাজগুলো করার জন্য।

শিখন অভিজ্ঞতা ৬

বন্ধু নেটওয়ার্কে ভাব বিনিময়

ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি নেটওয়ার্ক কী, নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করে। আমরা একটি নেটওয়ার্কও বানিয়েছিলাম। এবার আমরা নানা ধরনের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানব, এটি অতীতে কেমন ছিল, এখন কেমন হচ্ছে সেটি দেখব। এবার আমরা তারবিহীন নেটওয়ার্ক কীভাবে শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে যে আমাদের ইতিহাস জড়িয়ে আছে তা জানব। পিনা আর ন্যানোর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। আমরা ওদের সঙ্গে অনেকগুলো কাজও করব।

সেশন–১: ইতিহাস থেকে অতীতের নেটওয়ার্ক জানি

আজকে পিনার মন ভালো নেই। অনেক দিন তার সঙ্গে ন্যানোর যোগাযোগ হচ্ছে না। সে ভাবছে যদি এমন কোনো পথ থাকত যা দিয়ে ন্যানোর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত। মামার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে ইন্টারনেট সম্পর্কে জেনেছে; কিন্তু সেটা তো তারযুক্ত নেটওয়ার্ক। তারের মাধ্যমে সংযোগ; কিন্তু এখন যদি তার না থাকে। এই যে আমরা তার ছাড়া মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করি। কীভাবে সম্ভব? এভাবে যদি ন্যানোর সঙ্গেও যোগাযোগ করা যেত। ছাদে এসব ভাবতে ভাবতে পিনা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এমন সময় দূর থেকে সে ডাক শুনতে পাচ্ছে, 'পিনা, এই পিনা, আমি চলে এসেছি।'

পিনা : আরে ন্যানো, এত্তদিন পর তুমি এলে! তোমাকে কত খুঁজেছি। কোনোভাবেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। তুমি তো কম্পিউটারের ভিতরে ছিলে, বেরিয়ে এলে কী করে?

ন্যানো : আমি অন্য গ্রহে আমার মামার বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলাম, সেখানে তুমি যোগাযোগ করতে পারছিলে না। দূর গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বিশেষ তরঙ্গের প্রয়োজন হয়।

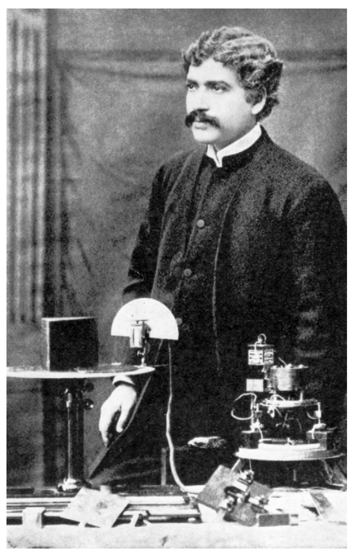

পিনা : ন্যানো, কী যে সব কঠিন শব্দ বলো না তুমি! এগুলো তো আমি কিছুই বুঝি না। আমি শুধু জানি, নেটওয়ার্ক দুই রকম–তারবিহীন আর তারযুক্ত।

ন্যানো : হুম এবার তোমাকে আরও ভালো করে শিখাব। এরপর বন্ধুদের নিয়ে তোমরা নিজেরাও একটা নেটওয়ার্ক বানাবে।

জানো পিনা, প্রথম যারা বিনা তারের যোগাযোগ শুরু করেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন কিন্তু তোমার দেশের একজন বিজ্ঞানী, তাঁর নাম জগদীশ চন্দ্র বসু। ১৮৯৭ সালে তিনিই প্রথম মিলিমিটার তরঙ্গের মাধ্যমে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে তারবিহীন যোগাযোগ স্থাপন করেন।

এই আবিষ্কারের সময় অন্যান্য দেশগুলোতেও অনেক বিজ্ঞানী তারের সাহায্য ছাড়া যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন, যাদের মধ্যে সফল হন ইতালির বিজ্ঞানী মার্কনি (Guglielmo Marconi).

সেখান থেকে অন্য বিজ্ঞানীরাও গবেষণা করতে থাকেন, আবিষ্কার হয় রেডিও। যা যোগাযোগে আনে এক অসাধারণ পরিবর্তন।

প্রতীকী ছবি : সৌজন্যে–তারেক মাসুদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

রেডিওর মাধ্যমে অনেক দূরে তথ্য পাঠানো যায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বেশিরভাগ সংবাদ পাওয়া যেত রেডিও (বেতার) মাধ্যমে। সেই সময়ে 'আকাশবাণী' নামক একটি রেডিও স্টেশনে প্রচারিত একটি গানের মাধ্যমে সংকেত পেয়ে মুক্তিযুদ্ধের নৌ-কমান্ডোরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৌ-বহরে একসঙ্গে আক্রমণ করেন।

এই গান রেডিওতে যখনই বেজে উঠবে তখনই আক্রমণ শুরু হবে এটি ছিল আক্রমণের গোপন সংকেত।

পিনা : বাহ কী চমৎকার! তারবিহীন যোগাযোগে তো অনেক সুবিধা। এই যে বিনা তারে এভাবে যোগাযোগ করে, সেটি আসলে হয় কী করে?

ন্যানো : এগুলোর প্রতিটাই আসলে নানা ধরনের তরঙ্গ। শিক্ষক তোমাদেরকে পরবর্তী শ্রেণিতে সব বুঝিয়ে দেবেন। হয়তো তোমরাও এরকম অনেক নতুন কিছু আবিষ্কার করবে।

হঠাৎ পিনা শুনতে পায়, কে যেন দূর থেকে ডাকছে, এই পিনা, পিনা! খেলতে যাবি না? আরে ন্যানো যে মিলিয়ে যাচ্ছে! আর তখন হাজির হলো পিনার বান্ধবী রিনি। পিনা বুঝতে পারে সে আসলে স্বপ্ন দেখছিল; কিন্তু কী সুন্দর একটা স্বপ্ন ছিল!

আচ্ছা বন্ধুরা, আমরা পিনা আর ন্যানোর গল্প থেকে তারবিহীন নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানলাম। আমাদের চারপাশে কি এমন তারবিহীন নেটওয়ার্ক আছে? একটু খুঁজে দেখি তো আমাদের শ্রেণিকক্ষের মধ্যে বা আমাদের স্কুলে তারবিহীন নেটওয়ার্ক আছে কি না! নিচের ছকটি পূরণ করি।

স্কুলের মধ্যে তারযুক্ত নেটওয়ার্ক	স্কুলের মধ্যে তারবিহীন নেটওয়ার্ক
টেলিফোন	মোবাইল

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

এবার আমরা আমাদের বাড়ির চারপাশে কী কী ধরনের নেটওয়ার্ক আছে এবং সেগুলো কোথা থেকে কোথায় গেছে দেখে আসব।

সেশন–২: আমার চারপাশে আছে নানা ধরনের নেটওয়ার্ক

আমরা আমাদের চারপাশের বিভিন্ন যন্ত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখি কোনটি তারের সাহায্যে এবং কোনটি তারের সাহায্য ছাড়া তথ্য আদানপ্রদান করে।

যন্ত্র	তথ্য পাঠানোর মাধ্যম	আমার কোনো পর্যবেক্ষণ
মোবাইল ফোন	তারবিহীন	তথ্য গ্রহণ ও প্রেরণ
রেডিও	তারবিহীন	শুধু তথ্য গ্রহণ

আমরা এবার খুঁজে বের করি নেটওয়ার্কগুলো কীভাবে কাজ করে। তারযুক্ত এবং তারবিহীন নেটওয়ার্কের জন্য আমরা দুটি দলে বিভক্ত হই, একদল তারবিহীন নেটওয়ার্কের সুবিধা-অসুবিধা এবং অপর দল তারযুক্ত নেটওয়ার্কের সুবিধা-অসুবিধা খুঁজে বের করি এবং নিচের ছকে উপস্থাপন করি।

দল-১ : তারযুক্ত নেটওয়ার্ক		দল-২ : তারবিহীন নেটওয়ার্ক	
সুবিধা	অসুবিধা	সুবিধা	অসুবিধা

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

এবার আমরা আমাদের বাড়ির যে কোনো একটি নেটওয়ার্কের চিত্র এঁকে আনব। সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা যেমন ভ্রমণ পরিকল্পনা করেছিলাম, সেরকম যেকোনো একটি নেটওয়ার্ক আঁকব, কিন্তু এটি আমার বাড়ির আশপাশের কোনো নেটওয়ার্ক হবে।

সেশন–৩: চলো নেটওয়ার্ক দিয়ে তথ্য পাঠাই

আগের সেশনে আমরা বিভিন্ন তারযুক্ত ও তারবিহীন নেটওয়ার্ক খুঁজে বের করেছি। নেটওয়ার্কগুলোর মূল কাজ হলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তথ্য আদানপ্রদান করা। কিন্তু এই কাজ আসলে কীভাবে হয়? এই যে কিছু নেটওয়ার্ক তারযুক্ত থাকে, ওই তার দিয়ে সেই নেটওয়ার্কে তথ্য কীভাবে যায়? আবার কিছু নেটওয়ার্কে তো তারও থাকে না! তাহলে সেই নেটওয়ার্ক দিয়েই বা তথ্য কীভাবে যায়? ব্যাপারটা ভাবতে বেশ অবাক লাগছে, তাই না?

একেক নেটওয়ার্ক আসলে একেক পদ্ধতিতে কাজ করে। চলো আমরা খুব সাধারণ দুইটি নেটওয়ার্কে তথ্য বিনিময় সম্পর্কে জেনে নেই।

তারযুক্ত নেটওয়ার্ক হিসেবে একটি টেলিফোন থেকে অন্য টেলিফোনে যেভাবে তথ্য আদানপ্রদান হয়–

প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে আমরা টেলিফোনের মাধ্যমে কী ধরনের তথ্য পাঠাচ্ছি। আমরা যখন টেলিফোনে কথা বলি, তথ্য হিসেবে শব্দকে পাঠাই অন্য টেলিফোনে। টেলিফোনের হ্যান্ডসেটে একটা মাইক্রোফোন থাকে। মাইক্রোফোনের কাজ হলো আমাদের বলা শব্দগুলোকে ইলেকট্রিক সিগন্যালে রূপান্তর করা। ইলেকট্রিক সিগন্যাল মূলত একধরনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, যা তারের মধ্য দিয়ে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পাঠানো যায়। টেলিফোনে যে তারের লাইন থাকে সেটার ভিতর আসলে তামার তার থাকে। তামা একটি ধাতু যা খুব সহজে তড়িৎ পরিবহন করতে পারে। তাই তামার তারের মধ্য দিয়ে মাইক্রোফোনের মধ্যে রূপান্তর হওয়া ইলেকট্রিক সিগন্যাল সহজেই অপর পাশে পাঠানো যায়। অন্য যে টেলিফোনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ গ্রহণ হবে সেখানে থাকে একটা লাউডস্পিকার। লাউডস্পিকারটি অন্য প্রান্ত থেকে আসা ইলেকট্রিক সিগন্যালকে রূপান্তর করে আবার শব্দে পরিণত করে। তখন আমরা সেই শব্দ লাউডস্পিকারে শুনতে পাই।

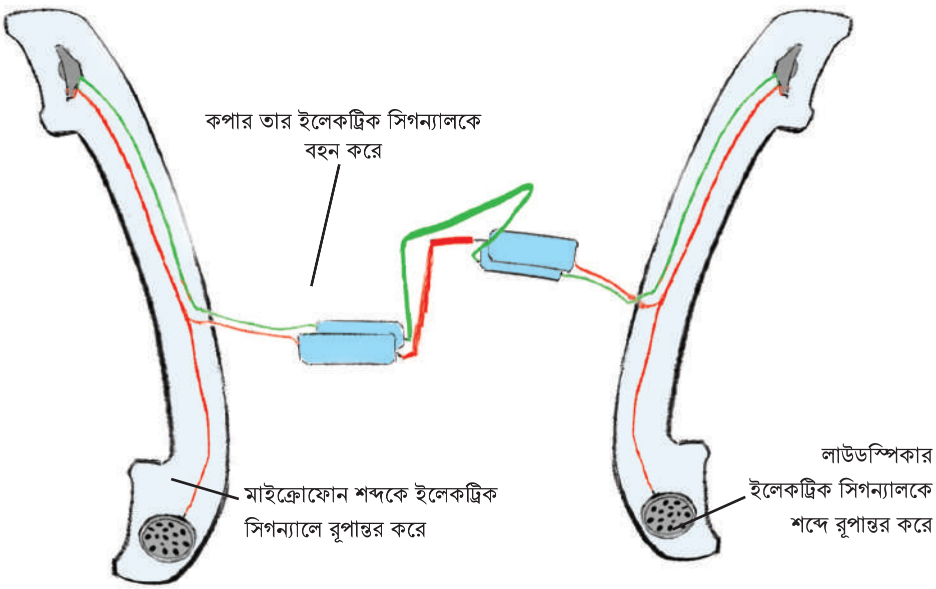

তাহলে আমাদের তারযুক্ত নেটওয়ার্কের তথ্য আদানপ্রদানের মূল কাজগুলো কী তা আবার একটু দেখে নেই–

ক) যে ডিভাইস থেকে তথ্য যাবে সেখানে তথ্য প্রেরণ করার মতো একটি উপকরণ থাকে যা তথ্যকে অন্য

একটি মাধ্যমে রূপান্তর করল।

খ) রূপান্তরিত তথ্য একটি তারের মাধ্যমে যে ডিভাইসে পৌঁছানোর কথা সেখানে গেল।

গ) যে ডিভাইস তথ্য গ্রহণ করল সেটি রূপান্তরিত তথ্যকে আবার আগের অবস্থায়/মাধ্যমে ফেরত নিয়ে এলো।

টেলিফোনের পাশাপাশি অন্য সব তারযুক্ত নেটওয়ার্কই সচরাচর এই সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করেই তথ্যের আদানপ্রদান করে।

এবারে চলো একটা কাজ করা যাক। আমরা অ্যালগরিদমের মাধ্যমে একটি কাজ করার ধাপগুলো লেখা শিখেছি।

টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের ধাপগুলো নিয়েও একটি অ্যালগরিদম নিচে লিখে ফেলি চলো–

১ম ধাপ – একটি টেলিফোনে কথা বলি

২য় ধাপ – আমার বলা কথা মাইক্রোফোন দিয়ে ইলেকট্রিক সিগন্যালে রূপান্তরিত হলো।

এবার চলো তারবিহীন নেটওয়ার্কে কীভাবে তথ্য আদানপ্রদান হয় সেটারও একটু ধারণা নেয়া যাক। তারযুক্ত নেটওয়ার্কে যেহেতু টেলিফোনের কথা আলোচনা হলো, আসো এখন আমরা মোবাইল ফোন কীভাবে তথ্য পাঠায় তা জেনে নেই।

আমরা এর আগে রেডিও তরঙ্গ সম্পর্কে জেনেছিলাম। আমাদের মোবাইল ফোন যখন তথ্য পাঠায় তখন রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমেই সেটা পাঠায়। প্রতিটি মোবাইল ফোনে একটি রেডিও তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ করার অ্যান্টেনা থাকে। আমরা যখন মোবাইলে কথা বলি তখন মোবাইল থেকে চারপাশে এই অ্যান্টেনা দিয়ে রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সেই তথ্য ছড়িয়ে পরে। মোবাইলের এই তথ্য গ্রহণ করার জন্য নেটওয়ার্ক টাওয়ার থাকে।

নেটওয়ার্ক টাওয়ার এই তথ্য গ্রহণ করে যে মোবাইলে ওই তথ্য পাঠিয়ে দেয়া দরকার আবার সেখানে পাঠিয়ে দেয়। ওই মোবাইল ফোন তখন নিজের অ্যান্টেনা দিয়ে আবার সেই তথ্য গ্রহণ করে। তাহলে তারবিহীন নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের মূল পদ্ধতি নিচের মত–

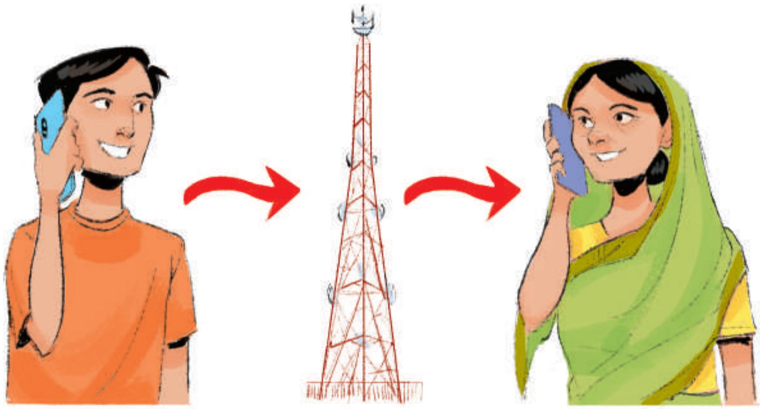

ক) প্রথমে একটি ডিভাইস থেকে তথ্য পাঠালাম।

খ) রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সেই তথ্য একটি নেটওয়ার্ক টাওয়ারের কাছে গেল।

গ) নেটওয়ার্ক টাওয়ার থেকে আবার রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সেই তথ্য গ্রাহক ডিভাইসের কাছে চলে গেল।

বেশিরভাগ তারবিহীন নেটওয়ার্ক এই সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করেই চলে।

চলো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের ধাপগুলো নিয়ে নিচে একটি অ্যালগরিদম লিখে ফেলি–

আমরা এখানে খুব সরল উপায়ে দুটি তারযুক্ত ও তারবিহীন নেটওয়ার্কে তথ্যের আদানপ্রদান সম্পর্কে জানলাম। বাস্তবে কিন্তু নেটওয়ার্কগুলো আরো জটিল উপায়ে কাজ করে। যখন আমরা আরও বড় হব তখন নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান প্রদান নিয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারব।

সেশন–৪: আমাদের নিজেদের নেটওয়ার্ক রাখব নিরাপদ

বন্ধুরা, ইতোপূর্বে আমরা বিদ্যালয় শিখন নেটওয়ার্ক বানিয়েছিলাম। এবার আমরা সেই বিদ্যালয় শিখন নেটওয়ার্ককে আরও নিরাপদ করব। ধরো তুমি তোমার বন্ধু রাহাতের জন্মদিনে তাকে অবাক করে দেওয়ার জন্য আরেক বন্ধু তারেকের সঙ্গে মিলে একটি উপহার বানাচ্ছ। তুমি চাও পরিকল্পনাটি শুধু তোমার এবং তারেকের মধ্যেই যেন থাকে। কোনভাবেই যেন রাহাত বুঝতে না পারে। এখন তুমি কীভাবে তোমাদের এই বিষয়টি গোপন রাখবে এবং কাজটি করবে? নিশ্চয়ই কোনো গোপন সংকেতের মাধ্যমে। আমাদের বন্ধু নেটওয়ার্কের নিরাপত্তার জন্য আমরা এমন একটি নিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহার করব।

এবারে আমাদের বন্ধু নেটওয়ার্কের কাজ হবে আমাদের সকল প্রয়োজনীয় বাড়ির কাজ এবং অন্যান্য সকল জরুরি তথ্য নিজেদের মধ্যে গোপনীয়ভাবে পাঠানো।

আচ্ছা, আমরা আগে জেনে নিই কীভাবে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য নিরাপদভাবে পাঠানো যায়। প্রত্যেক নেটওয়ার্কের রয়েছে কিছু গোপন সংকেত। এই সংকেত যদি আরেকটি যন্ত্র না জানে, তাহলে সেই নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পারবে না। নির্দিষ্ট যন্ত্র যদি সেই গোপন সংকেতটি জানে, তাহলে সেই নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পারবে। তাই তথ্য গোপন করে পাঠানো খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত

নেটওয়ার্কগুলো অনেক বেশি নিরাপত্তাযুক্ত করা হয়, যেন অন্য কেউ গোপনীয় তথ্য পেয়ে না যায় এবং ক্ষতি না করতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিনা তারে গোপন তথ্য আদানপ্রদান করা হতো। জার্মানি ও তাঁর বন্ধুরাষ্ট্র এবং মিত্রশক্তির মধ্যে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছিল এরকম গোপন বার্তার অর্থ উদ্ধারের মাধ্যমে। পরবর্তী ক্লাসসমূহে তোমরা আরও ভালোভাবে জানবে।

আমরা গত বছর নেটওয়ার্কের বিভিন্ন অংশ যেমন–প্রেরক, প্রাপক, সার্ভার, রাউটার ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছিলাম, এবার আমাদের তৈরি নেটওয়ার্কের সঙ্গে সেই অংশগুলোর তুলনা করব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমরা যেন নেটওয়ার্কের গোপনীয়তা ঠিক রাখতে পারি।

<u>গোপনীয়তা রক্ষায় আমরা নিচের খেলাটি খেলব</u>–

এটি অনেকটা ফুলটোক্কা খেলার মতো, যেখানে আমরা আমাদের বন্ধুদের কোনো একটি গোপন নাম দিয়ে ডাকি এবং তারপর চোখ বন্ধ করে রাখা আরেকটি বন্ধুর কপালে টোক্কা দিতে বলি, তারপর চোখ বাঁধা বন্ধুটির কাজ হয় সেই ছদ্ম নামে ডাকা বন্ধুকে খুঁজে বের করা।

প্রথমে আমরা ছয়টি দলে বিভক্ত হই। আমরা চারটি দল দুটি করে গোপন তথ্য পাঠাব অন্য দলের কাছে আর বাকি দুটি দল হবে হ্যাকার। ওই দুই দল তথ্য চুরি করে জানতে চাইবে। কীভাবে গোপনীয় বার্তা পাঠাতে হয়, তার জন্য দরকার আমাদের এনকোড অর্থাৎ তথ্যকে গোপন করা ও ডিকোড অর্থাৎ গোপন তথ্যকে উদ্ধার করা। সেটি আমরা করব বিভিন্ন বর্ণকে একটির জায়গায় আরেকটি প্রতিস্থাপন করে। এখন পরের পৃষ্ঠার ছকটি ভালো করে দেখো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রকৃত অক্ষর	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
প্রতিস্থাপিত অক্ষর	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ

এরূপ প্রতিস্থাপন করে তোমরা কোড করলে। এখন 'কাকা' শব্দটি হয়ে যাবে 'টাটা' যা অন্য দলের জন্য বোঝা অনেক কঠিন হবে। এভাবেই মূলত বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সাহায্যে তথ্য গোপন করে পাঠানো হয়।

তোমাদের কাজ হবে এমন করে বার্তা লেখা যেন অন্য দল সেটি বুঝতে না পারে। হ্যাকার দলের কাছে প্রতিটি দলের বার্তা তিন মিনিট করে থাকবে। এর মধ্যে যদি তারা অর্থ উদ্ধার করতে না পারে, তাহলে যে দলটি বার্তা লিখেছিল তারা জিতবে।

বন্ধুরা, এখন আমরা বুঝতে পারলাম কীভাবে নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা দেওয়া হয়। আমরা এবার নিজেরা বের করব কীভাবে নেটওয়ার্ক নিরাপদ রাখে।

নেটওয়ার্ক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আমরা তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের তথ্য নিরাপদ রাখতে হলে সেই নেটওয়ার্ককে নিরাপদ রাখতে হবে, যেন খারাপ মানুষের হাতে সেই তথ্য চলে না যায়। হ্যাকাররা অনেক সময় তথ্য নিয়ে অনেক ক্ষতি করতে পারে। যেমন ধর, কেউ কোনো ব্যাংকের নেটওয়ার্কের তথ্য নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করল। আবার কেউ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল পরিবর্তন করল, কেউবা অন্য কারও মোবাইল ফোনের কথা শুনে ফেলল এবং সেটি দিয়ে ক্ষতি করল। এরকম আরও নানা কারণে আমাদের নেটওয়ার্ককে নিরাপদ রাখতে হয়।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

অতীতে আমরা যেভাবে বিদ্যালয় শিখন নেটওয়ার্ক ও অভিভাবক নেটওয়ার্ক বানিয়েছি সেভাবে একটি নেটওয়ার্ক বানাব।

সেশন–৫: তারবিহীন স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক

বন্ধুরা, তোমরা কি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের নাম শুনেছ? এটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। এটি আমাদেরকে তথ্য আদানপ্রদানে ব্যাপক সহায়তা করে। এটি মহাকাশে তার কক্ষপথে ঘুরছে এবং তথ্য পাঠাচ্ছে। অনেক সময় আমরা মোবাইল, ঘড়ি, জিপিএস (GPS-Global Positioning System)-এর মাধ্যমে আমাদের অবস্থান বের করতে পারি। এই অবস্থান বের করা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্লেন, জাহাজ, গাড়ি সঠিক পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য সাটেলাইট থেকে তথ্য নেয়। এটিও একটি তারবিহীন নেটওয়ার্ক। আমরা এবার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের অবস্থান দেখব, তারপর সেটি থেকে আমাদের স্কুলের অবস্থান কোথায় সেটি বের করব।

আমরা এবার নিচের মানচিত্রে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটি চিহ্নিত করব এবং সেই সঙ্গে সেটি কীভাবে তথ্য আদানপ্রদান করে সেটি নিজেরা আঁকব। আমাদের মানচিত্রে আমরা আমাদের স্কুলের অবস্থান চিহ্নিত করব, তারপর সেখান থেকে আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের অবস্থান সংযুক্ত করব।

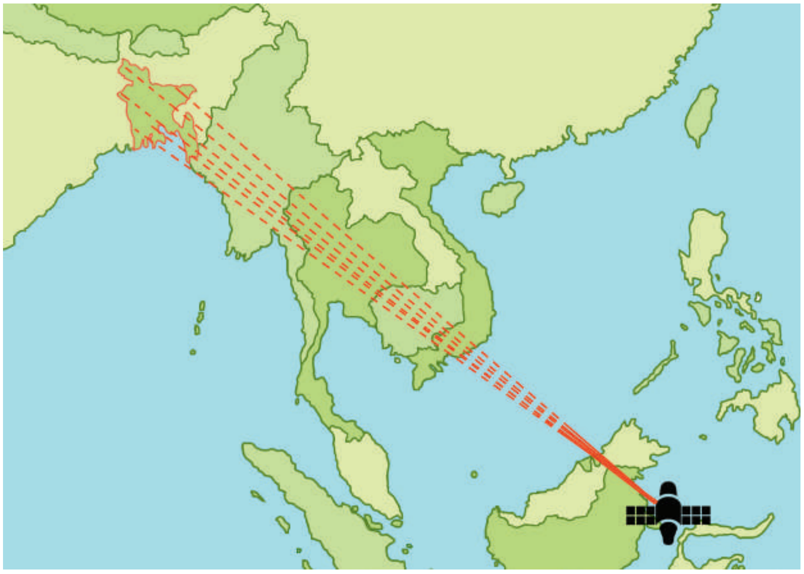

আমরা দেখতে পেলাম স্যাটেলাইটের অবস্থান কোথায় এবং আমাদের অবস্থান কোথায়। স্যাটেলাইট হচ্ছে বিনা তারের যোগাযোগ করার আরেক ধরনের নেটওয়ার্ক; যেটি আমাদেরকে তথ্য আদান-প্রদান করতে সাহায্য করে। দুর্গম এলাকায় অবস্থান খুঁজে বের করার জন্যও স্যাটেলাইট ব্যবহৃত হয়।

ব্যক্তিগত কাজে স্যাটেলাইট	ব্যবসাক্ষেত্রে স্যাটেলাইট

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

আমরা আমাদের নিজেদের জীবনের কোন কোন কাজে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক ব্যবহার করি, তা খুঁজে বের করব।

সেশন–৬: আমাদের বন্ধু নেটওয়ার্ক

আমরা সেশন ৪-এ যেমন বার্তা পাঠিয়েছিলাম সেই রকম আরেকটি বার্তা তৈরি করব যেটি আমাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাঠাব। নেটওয়ার্কটি হবে আমরা যেভাবে সেশন ৩-এ দলগতভাবে ভাগ হয়েছিলাম ঠিক সেই রকম করে নতুন দলে বিভক্ত হয়ে আমাদের বন্ধু নেটওয়ার্কটি গঠন করব। আমরা দলগতভাবে একটি বার্তা লিখব যেটি আরেক দলের কাছে পাঠাব। এবার আমার দলের সকল সদস্য বার্তাটি জানবে কিন্তু সেই বার্তা সেশন-৪ -এ যে বার্তা পাঠিয়েছি সেটার মতো এনকোড করা থাকবে, কীভাবে ডিকোড করতে হবে সেটি জানবে শুধু অন্য সহযোগী টিম।

এবার এসো নিচের কাজগুলো অনুসরণ করে খেলাটি খেলব :

১। আমরা নিজেদের দলের এবং হ্যাকার দলের বন্ধুদের বাড়ির অবস্থান জেনে একটি মানব নেটওয়ার্ক বানাব।

২। প্রতি দুইজন বার্তা প্রদানকারী বন্ধুর মধ্যে একজন হ্যাকার বন্ধু থাকবে।

৩। প্রথমে স্কুল থেকে সবচেয়ে দূরের বন্ধু বার্তাটি শুরু করবে, সে শুধু প্রথম অংশটি লিখবে, তারপর হ্যাকার দলের বন্ধুর কাছে নিয়ে গিয়ে কোডেড বার্তাটি দিবে। সেই বন্ধুর কাজ হবে গোপন বার্তাটিকে ডিকোড করা।

৪। ডিকোড করার জন্য তার হাতে সময় থাকবে ১ ঘণ্টা, এই সময় পরে তাকে বার্তাটি তার কাছের পরবর্তী বার্তা প্রেরণকারী বন্ধুকে দিতে হবে।

৫। এভাবে সকল বন্ধু পেরিয়ে বার্তাটি আবার বার্তা প্রেরণকারী দলের শেষ সদস্যের কাছে আসবে। যদি বার্তাটি হ্যাকার দলের সদস্যরা উদ্ধার করতে না পারেন তাহলে বার্তা প্রেরণকারী দল জিতে যাবে আর বার্তা উদ্ধার করলে হ্যাকার দল জিতে যাবে। এভাবে আমরা পুরো খেলাটি শেষ করব আর সেই সঙ্গে গঠিত হবে আমাদের বন্ধু নেটওয়ার্ক।

এবার এসো, আমরা আমাদের স্কুল ও বন্ধুদের বাসার অবস্থান নিচের ম্যাপে চিহ্নিত করি এবং আমাদের নেটওয়ার্ক বানাই।

বন্ধুরা আমরা যে নেটওয়ার্কটি বানালাম, এটি হলো আমাদের তারবিহীন বন্ধু নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কে আমরা নানান প্রয়োজনীয় তথ্য আদানপ্রদান করব এবং নেটওয়ার্কের গোপনীয়তা রক্ষা করব। এক্ষেত্রে যদি আমাদের মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট সংযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে ক্লাস সিক্সে আমাদের তৈরি করা বন্ধু কমিউনিটি নেটওয়ার্কের মতো বিনা তারে যোগাযোগ করতে পারব। সেখানে আমরা শুধু হেঁটে এক বন্ধু থেকে আরেক বন্ধুর কাছে যাওয়ার বদলে বার্তাটি মোবাইলে পাঠাব।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

কীভাবে বন্ধু নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী এবং গোপনীয় করা যায় তার জন্য তোমার কৌশলগুলো লিখে আনবে। আর আমরা বন্ধু নেটওয়ার্ক থেকে কী কী সুবিধা পেতে পারি তা লিখব।

বন্ধু নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করার কৌশল

শিখন অভিজ্ঞতা ৭
গ্রাহক সেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার

নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার কাজগুলো কীভাবে আরও সহজে পাওয়া যায় তার জন্য এখন ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে শহর থেকে গ্রাম পর্যায়ে সাধারণ নাগরিকেরাই এখন নাগরিক সেবা নিচ্ছেন। তাছাড়া নিজেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও আমরা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে হাতের নাগালে পাচ্ছি। আগামী কয়েকটি সেশনে প্রয়োজনীয় কাজগুলো কত সহজে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে সম্পন্ন করা যায়, আমরা তার কিছু অভিজ্ঞতা নেব।

সেশন–১: নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের ধারণা তালিকা প্রস্তুত

প্রিয় শিক্ষার্থী, এই সেশনে স্বাগতম। আগে যেভাবে জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করেছিলাম, ঠিক একইভাবে এই শ্রেণিতেও নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের জন্য ডিজিটাল মাধ্যমের কী কী ব্যবহার হতে পারে তার জন্য কিছু কাজ করব। এসো, নিচের উদাহরণটি আমরা সবাই নীরবে পাঠ করি।

জয়িতার বাবাকে প্রতি মাসের বিদ্যুৎ বিল ব্যাংকে গিয়ে পরিশোধ করতে হয়। কখনো কখনো লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে বিল দিতে গিয়ে অফিসেরও দেরি হয়ে যায়। আর বাড়ি থেকে ব্যাংকে যাওয়া-আসাতেও বেশ কিছু টাকা যাতায়াত ভাড়ায় খরচ হয়ে যায়। প্রায়ই সে তার বাবাকে বলতে শোনে, ‘আজও অফিসে দেরি হয়ে গেছে!’ তাই সে এই মাসের বিলের জন্য আগেই তার বাবার মোবাইলে একটা মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ ইনস্টল করে ও অ্যাকাউন্ট খুলে তাতে টাকা রিচার্জ করে নিয়েছে। বিল আসামাত্র জয়িতা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ওইসব তথ্য পূরণ করে কয়েক মিনিটে বিল পরিশোধ করে দেয়।

এত সহজে সময় আর পরিশ্রম ছাড়াই বিল পরিশোধ করায় জয়িতার বাবাও খুব আনন্দিত। তিনি নিজেই পরের মাস থেকে এভাবেই বিল পরিশোধ করবেন বলে জানালেন।

উপরের কেসস্টাডির ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার চেষ্টা করি।

- এখানে মূলত কোন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে?
- জয়িতার বাবা যে সেবাটা গ্রহণ করলেন, সেটাকে এক কথায় কী বলা যায়?
- মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আর্থিক বিনিময়ের প্রক্রিয়াটাকে কী বলে?
- এমন আর কী কী সেবা রয়েছে যেগুলো আমরা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে পাই?

- কেনাকাটা বা আর্থিক লেনদেনের জন্য আমাদের পরিচিতদের মধ্যে কেউ কি ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করেছেন?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের ধারণা জানতে পারলাম। এবার নিচের ছকে কয়েকটি নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের নাম লিখে ফেলি।

নাগরিক সেবা	ই-কমার্স

জরুরি সেবা পাওয়ার ডিজিটাল মাধ্যমসমূহ:

নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স মূলত সেবা যিনি দেবেন (সেবা দাতা) ও যিনি নেবেন (সেবা গ্রহীতা) উভয়কেই ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে সম্পন্ন করতে হয়। ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। বর্তমান সময়ে যে কোনো সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের সুবিধার্থে ডিজিটাল মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সেবা সহজ করে নিচ্ছে। এমনকি খুব সাধারণ মোবাইল ফোনে মেসেজ করেও আজকাল সেবা পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের বাবা-মায়ের মোবাইল ফোনে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রয়েছে, সেখানেও দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা দেওয়ার পেজ বা গ্রুপ থাকে। সেখান থেকেও খুব সহজে যোগাযোগ করে সেবা বা পণ্য পাওয়া যায়। তাহলে এসো নিচের ঘরগুলোতে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স মাধ্যমগুলোর নাম লিখে ফেলি।

তবে কোনো প্রতিষ্ঠানের সেবা নেওয়ার জন্য আর্থিক লেনদেন অবশ্যই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ ব্যবহার করে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে হয়। কেসস্টাডিতে আমরা লক্ষ করেছি, জয়িতা বিল পরিশোধের আগে বাবার মোবাইলে একটি ব্যাংকিং অ্যাপ ইনস্টল করে অ্যাকাউন্ট খুলেছিল।

সেশন–২: নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের সুবিধা

আগের সেশনে আমরা নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের ধারণা পেয়েছি। এখন সেই সেবাগুলোর সুবিধাসমূহ আমরা চিহ্নিত করব। আমাদের মাঝেও এমন অনেকেই আছি যাদের আগের সেশনের উদাহরণটিতে জয়িতার মতো কোনো নাগরিক সেবা বা ই-কমার্সের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেমন–উপবৃত্তির টাকা বা আমাদের পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তির ভাতা পেয়েছি।

ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক ও ই-কমার্স সেবা নেওয়া ও দেওয়ার সময়, যাতায়াতের খরচ কমিয়ে দেয়। অল্প কিছু সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে আমরা এই সেবাগুলো পেয়ে থাকি। এই সুবিধাগুলোর জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে সেবা গ্রহণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। নিচের ছকে আমরা সুবিধাগুলো লিপিবদ্ধ করি।

ক্রম	নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের সুবিধা
১	খরচ কমে যায়।
২.	খুব কম সময়ে সেবা পাওয়া যায়।
৩.	সেবা দাতার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	

এবার নিচের ছবিটি ভালো করে লক্ষ করি এবং দলগতভাবে আমরা প্রদত্ত ছকে লিখি–শিক্ষার্থী হিসেবে কোন প্রয়োজনে কী কী সেবা এখান থেকে পেতে পারি?

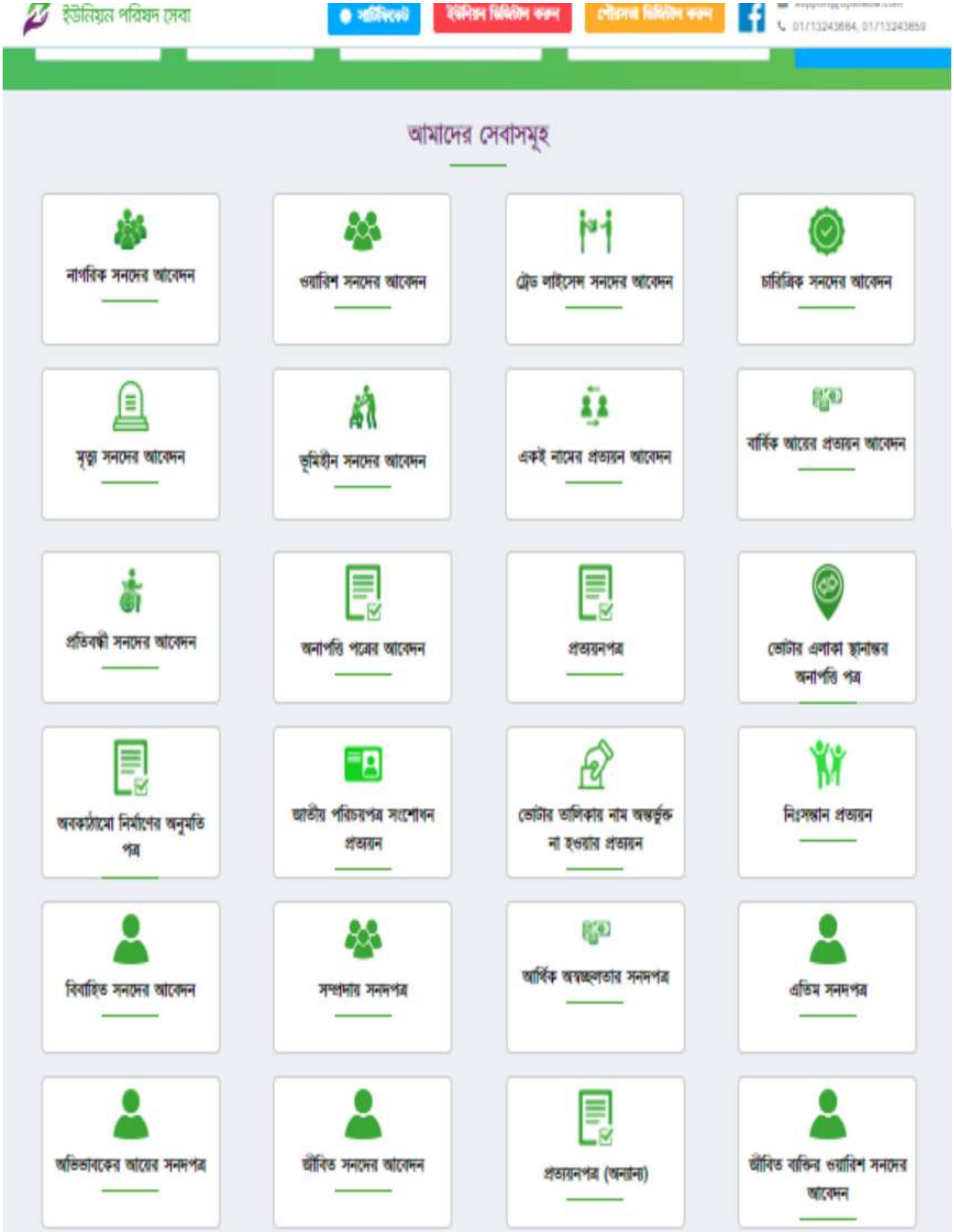

ক্রমিক	সেবার নাম	কোন কাজের জন্য?
১.	প্রত্যয়নপত্র	বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আবেদনের জন্য
২.	অভিভাবকের আয়ের সনদ	আর্থিক সহায়তা বা বৃত্তি পাওয়ার জন্য
৩.		
৪.		
৫.		

সেশন–৩: নাগরিক সেবা প্রাপ্তির ধাপসমূহ

আগের সেশনে একটি ওয়েবসাইটে কী কাজে কোন নাগরিক সেবা নিব, তার তালিকা তৈরি করতে পেরেছি। আজকে আমরা এমন একটি সেবা পাওয়ার জন্য আমাদের কী কী ধাপ অনুসরণ করতে হয় তা চিহ্নিত করব এবং সে অনুযায়ী একটি প্রবাহচিত্র প্রণয়ন করব।

আমি যে সেবাটা নিতে চাই সেটির জন্য আমাকে ডিজিটাল মাধ্যমে খুঁজতে হবে যে, কোন ওয়েবসাইট বা অ্যাপের সহায়তায় আমি সেই সেবাটি পেতে পারি। সরকারি-বেসরকারি সকল সেবাদাতার নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট রয়েছে। আবার সরকারি সকল অফিসের ওয়েবসাইটে ‘সিটিজেন চার্টার’ বলে একটি বিভাগ থাকে যেটিতে বলা থাকে কীভাবে একজন সাধারণ নাগরিক তার কাঙ্ক্ষিত সেবা পেতে পারেন। কী কী ধাপ বা কার সঙ্গে যোগাযোগ করলে সঠিক উপায়ে সেবাটি কোনো রকম বিড়ম্বনা ছাড়াই পাওয়া যাবে তার নির্দেশনা দেওয়া থাকে এখানে। তাছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে কীভাবে কোনো সেবা পাওয়া যাবে তারও নির্দেশনা সেখানে দেওয়া থাকে। ইদানীং অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা পাওয়ার

ধাপগুলো নিয়ে ভিডিও নির্দেশনা বা বিজ্ঞাপনও তৈরি করে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য যদি এমন একটি ওয়েবসাইট তৈরি করি, যেখানে এমন করেই সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতিগুলো উল্লেখ করতে হয়, তাহলে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটা নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি।

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	সেবামূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
১	শিক্ষার্থী ভর্তি পরিচালনা	বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভর্তির নোটিশ প্রদান	নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে ভর্তি ফরম ক্রয়	ডিসেম্বর	প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও ভর্তি কমিটি
২	লাইব্রেরি ব্যবহার				
৩	বিজ্ঞান গবেষণাগার ব্যবহার				
৪	প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ				
৫	বার্ষিক পুরস্কার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান				

পরের পাতার ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছি? এর মাধ্যমে কী সেবা পাওয়া যায়? নির্দিষ্ট সেবা পাওয়ার জন্য কী কী ধাপ বা করণীয় রয়েছে?

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

নাগরিকদের সহজেই সেবা প্রদানের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানই এখন মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। ফলে সেবা এখন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। উপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কত সহজেই কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করে একজন সাধারণ নাগরিক সেবা নিতে পারছেন। তাহলে আমার সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের সেবাগুলো পাওয়ার জন্য যদি এমন একটা অ্যাপ তৈরি করতে হয়, তাহলে সেটির জন্য পরের পাতায় দেয়া ফ্লোচার্টটি আমরা বাড়ি থেকে পূরণ করে নিয়ে আসব।

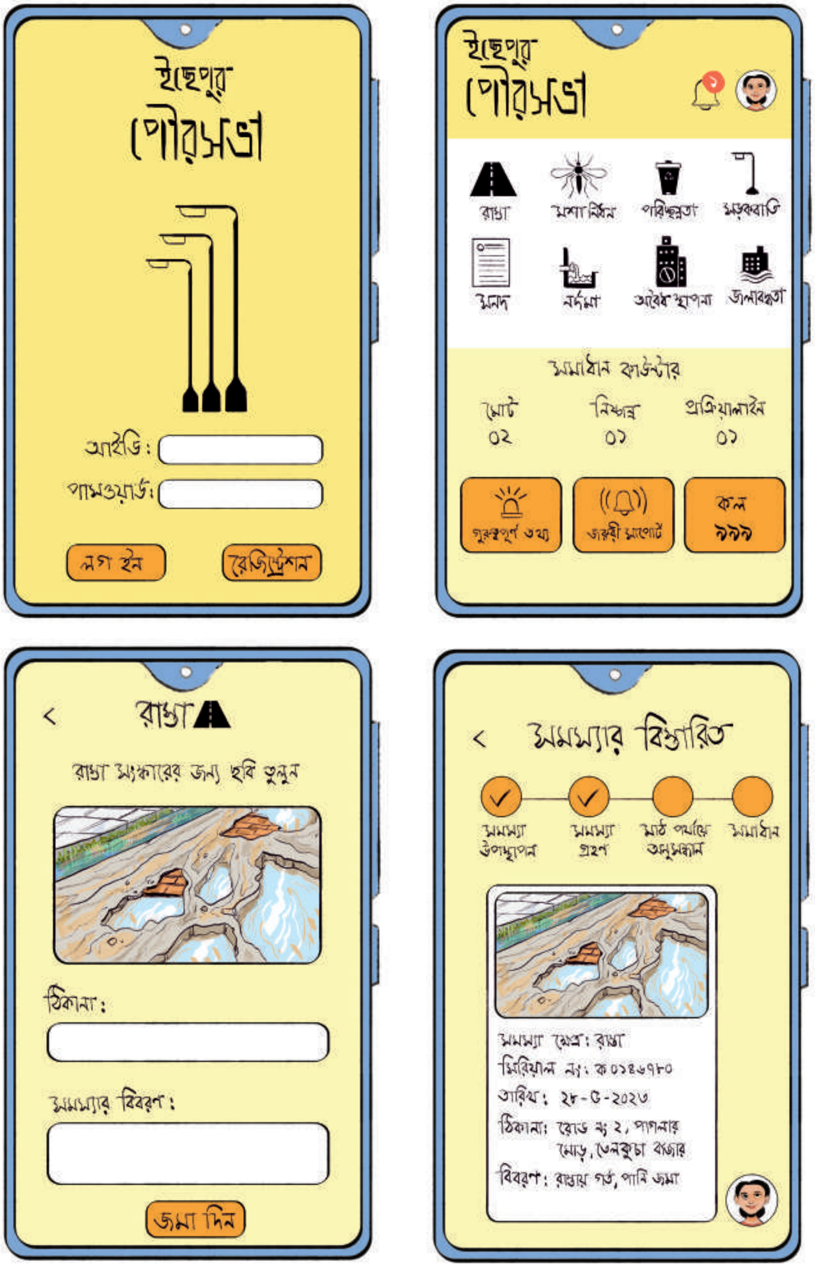

সেশন–৪: ই–কমার্সের সেবাপ্রাপ্তির (ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে) ধাপ ও বিবেচ্য বিষয়াবলি

আজকের এই সেশনে আমরা জানব ই-কমার্সে গ্রাহক হিসেবে কীভাবে পণ্য বা সেবা নিতে হয়। আরেকটু বড় হলে আমরাও ই-কমার্সের মাধ্যমে কিছু কিছু আয় করার চেষ্টা করব। ই-কমার্সের প্রচলনের ফলে অনেকে এখন খুব সহজেই অল্প পুঁজি নিয়েই ব্যবসা শুরু করেছে। আমাদের এখানে কেউ কি আছি যারা ই-কমার্সের কোনো অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারি? আমরা একজন গ্রাহক এবং একজন সেবাদাতার অভিজ্ঞতা শুনব। আমাদের নিজেদের গ্রাহক বা সেবাদাতা হিসেবে না হলেও অন্য কারও কথা বলতে পারি। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম যে ই-কমার্সে গ্রাহক হিসেবে আমাদের পাঁচ থেকে ছয়টি ধাপে পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে হয়।

নাগরিক সেবার মতোই ই-কমার্সের জন্যও কয়েকটি ধাপে সেবা নিতে হয়। তবে ই-কমার্স সেবাদাতাদের উদ্দেশ্য হলো পণ্য ক্রেতার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো পক্ষ পণ্য ও অর্থ লেনদেন করে থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিংও কাজে লাগাতে হয়। তাই ই-কমার্সের জন্য কয়েকটি ধাপ বেশি দরকার। তবে গ্রাহক হিসেবে আমাদের কোনো পণ্য অর্ডার করা, মূল্য পরিশোধ ও পণ্যটি গ্রহণ করা পর্যন্ত কাজ। মাঝে কিছু ধাপ পণ্য সরবরাহকারী বা ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান করে থাকে। যদি মূল্য অনলাইন বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে করা হয় সেক্ষেত্রে তা সফটওয়ারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিশোধিত হয়। তবে অনলাইন বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ে তথ্য প্রদানে আমাদের সতর্কতা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয়। একই পণ্য বা সেবা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দামে কম-বেশি হয়ে থাকে। আবার পণ্যের মানের ব্যাপারেও যাচাই করে নিতে হয়। এটা বুঝতে হলে আগে কেউ এই পণ্য সেই প্রতিষ্ঠান বা ই-কমার্সের সেবাদাতার কাছ থেকে কিনে থাকলে রিভিউ অংশে সে বিষয়ে কমেন্ট দেখে বুঝে নিতে পারি তিনি কতটা সন্তুষ্ট হয়েছেন।

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম, তাতে বুঝতে পারলাম যে পণ্য বা সেবার জন্য আমাদের প্রযুক্তি ও ব্যক্তির দ্বারা কাজটি করতে হয়। এখন একটা মজার অভিনয়ের মাধ্যমে কাজটি শ্রেণিকক্ষে সম্পন্ন করি। এ জন্য আমরা নিচের চরিত্রগুলোয় অভিনয় করব–

১. গ্রাহক বা যিনি সেবা নেবেন (একজন)

২. মোবাইল বা কম্পিউটার (একজন)

৩. পণ্য বা সেবা (চার/পাঁচজন)

৪. টাকা বা ব্যাংকের কার্ড বা মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ (একজন)

৫. বাহন (একজন)

৬. বাহক বা ডেলিভারিম্যান, যিনি মালামাল পৌঁছে দেবেন (একজন)

এতক্ষণ যে অভিনয়টি দেখলাম, এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা নিচের ছবির খালি ঘরগুলো পূরণ করে নিই।

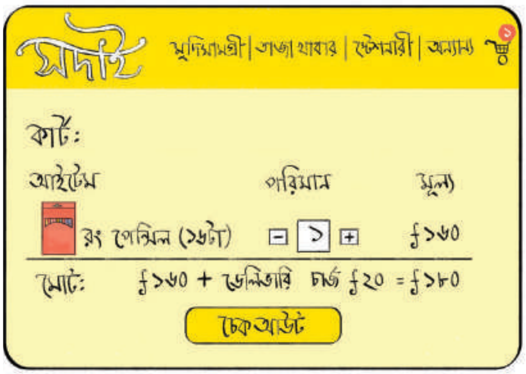

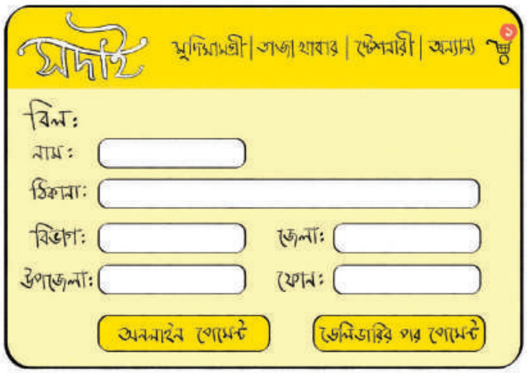

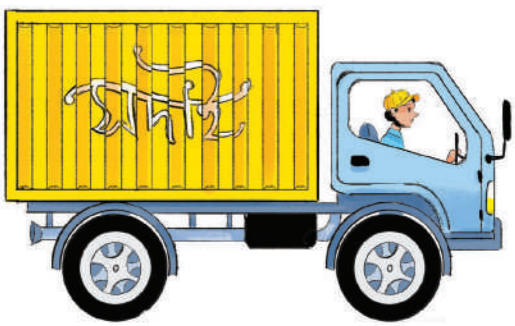

সেশন–৫: সেবাসমূহ প্রাপ্তির ধাপগুলো চিহ্নিত করে নির্দেশিকা তৈরি

আগের সেশনগুলোতে আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সেবার ধাপগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছি। আজ আমরা এই ধাপগুলো নিয়ে কয়েকটি নির্দেশিকা তৈরি করব যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারব।

আমরা সম্পূর্ণ শ্রেণি ছয় (০৬)টি দলে ভাগ হব। প্রতিটি দল নিচে প্রদত্ত কাজগুলো করব।

ক. ১ম দল : সেবা প্রপ্তির সাধারণ নিয়মাবলি;

খ. ২য়, ৩য়, ৪র্থ দল : শ্রেণিতে আলোচনা সাপেক্ষে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় তিনটি (এক দল একটি করে) নাগরিক সেবাপ্রাপ্তির ধাপ;

গ. ৫ম ও ৬ষ্ঠ দল : শ্রেণিতে আলোচনা সাপেক্ষে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দুটি (একেক দল একটি করে) ই-সেবা প্রাপ্তির ধাপ;

আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমরা বিদ্যালয়ে পত্রিকা তৈরি করেছিলাম। নির্দেশিকা অনেকটা সে রকম হবে। নির্দেশিকাটি যেন আকর্ষণীয় হয় সেজন্য প্রতিটি দল প্রতিটি বিষয়ের জন্য তথ্যচিত্র (ইনফোগ্রাফ) তৈরি করব। এই অভিজ্ঞতা বা অধ্যায়ের শেষে খালি যে দুটি পৃষ্ঠা দেওয়া হয়েছে; আমরা সেগুলোতে কাজ করব। কাজ শেষে সেই পৃষ্ঠাগুলো একসঙ্গে করে একটি নির্দেশিকা তৈরি করব এবং তা আমাদের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করব।

সেশন–৬: নাগরিক সেবা গ্রহণ

আজ আমরা কীভাবে নিবন্ধন যাচাই করা যায় তা জানব। আমরা এর আগে জরুরি সেবায় দেখেছিলাম কীভাবে আমাদের জন্ম নিবন্ধন করতে হয়। এই অভিজ্ঞতায়ও জেনেছি। স্থানীয় সরকারের ওয়েবসাইট বা অ্যাপ থেকেও আমাদের জন্ম নিবন্ধন করা যায়। আমাদের সকলের জন্য নিবন্ধন রয়েছে, কিন্তু সেটি সঠিক কি না, তা যাচাই করে নেওয়া জরুরি। তাই এই সেশনে আমরা দেখব কী করে জন্ম-তথ্য যাচাই করা যায়। এই নাগরিক সেবাটি খুব সহজেই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিস্টারের ওয়েবসাইট বা কিছু কিছু অ্যাপ (বেসরকারিভাবে তৈরি করা) থেকে করা সম্ভব। এই কাজটি করতে আমরা শিক্ষকের সহায়তা নেব।

শিক্ষকের মতো আমাদেরও জন্ম নিবন্ধন নম্বর গোপন রেখে যাচাইয়ের কাজটি করতে হবে। এটি হলো তথ্যের গোপনীয়তা। আগের শ্রেণিতে আমরা এটি জেনেছিলাম। আর এই কাজটি আমাদের নিজেদের করার জন্যই আজকের ক্লাসে আমরা নিয়মটি জেনে নিলাম। পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবির মতো করে আমরাও নিজেদের জন্ম নিবন্ধন নম্বরটি যাচাই করে নেব।

মজার একটি ব্যাপার লক্ষ করি। ওয়েবসাইটটি আমাকে বলছে ৯৬ থেকে ২২ বিয়োগ করে তার ফলটি লিখতে। কেন? অনেক ওয়েবসাইটেই এরকম কিছু ছোট ধাঁধা দেওয়া থাকে যেটি মানুষের জন্য সহজ ও রোবট বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের জন্য কঠিন। মানুষের পরিবর্তে কোনো রোবট বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যাতে এটি ব্যবহার করতে না পারে তার জন্যই এ ধরনের সমস্যা সমাধান করতে দেয়া হয়।

ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আমাদের জন্ম নিবন্ধন নম্বর, জন্ম তারিখ আর সংখ্যা সমাধানের উত্তরটি লিখে সার্চ দিলে নিচের ছবির মতো তথ্য প্রদর্শিত হবে। এর মাধ্যমে যাচাই করে নিতে পারি জন্ম নিবন্ধনে আমাদের সকল তথ্য সঠিক আছে কি না। নিচের ছবিতে অনেকগুলো ঘর খালি রয়েছে যেখানে আমাদের তথ্যগুলো দিয়ে তা পূরণ করব।

আমার পরিবার বা নিকটজনের প্রয়োজনে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর কী কী নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পারি, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করি এবং নিচের ঘরে লিখি।

১. টিকা সনদ	৬.
২. বয়স্ক ভাতার আবেদন ফরম	৭.
৩.	৮.
৪.	৯.
৫.	১০.

শ্রেণির বাইরের কাজ:

আমরা বিগত সেশনগুলোতে অনেক কাজের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-সেবা গ্রহণের উপায় জেনেছি। আমরা নিজেদের প্রয়োজন ছাড়াও আমার পরিবার বা নিকটজনের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার যে তালিকা গত ক্লাসে তৈরি করলাম, তার থেকে যে কোনো একটির জন্য আমরা ধাপ অনুসরণ করে সেবা গ্রহণ করব এবং আগামী ক্লাসে একটি প্রতিবেদন লিখে আনব।

প্রতিবেদন

নাগরিক সেবা গ্রহণে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার

সেবার নাম :

যার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে :

কোন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে :

অনুসরণ করা ধাপসমূহ :

সেবা প্রাপ্তির জন্য কতক্ষণ সময় লেগেছে :

প্রাপ্ত ফলাফল :

যোগাযোগে নিয়ম মানি

আমরা জেনেছি, যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে আমরা আমাদের চিন্তা, ধারণা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং মতামত একে অন্যের সঙ্গে আদান-প্রদান করি। আমরা যোগাযোগের কয়েকটি ধরন সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম, যেমন– মৌখিক যোগাযোগ, লিখিত যোগাযোগ, অমৌখিক বা সাংকেতিক যোগাযোগ। ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগ দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা : আনুষ্ঠানিক বা ফরমাল যোগাযোগ এবং অনানুষ্ঠানিক বা ইনফরমাল যোগাযোগ।

সেশন–১: যোগাযোগের ধরন

একবার সজল একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে তাদের উপজেলা পর্যায়ের একটি স্কুলে গেল। সজলের বাবা সজলকে পৌঁছে দিয়েই তার অফিসে চলে গেলেন। সজল একা একা ঐ বিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকল। এখানকার কাউকেই সজল চেনে না। প্রতিযোগিতার একটি বড় পোস্টার দেখে সে বুঝতে পারল তাকে কোথায় যেতে হবে। ওখানে গিয়ে দেখতে পেল একজন আপু ডেস্কে বসে আছেন এবং সবার উপস্থিতি নিশ্চিত করছেন। সজল তার কাছে গিয়ে তার নাম বলল এবং জিজ্ঞেস করল তাকে এখন কী করতে হবে। আপু কথা বলা শুরু করতে না করতেই সজলের বয়সি আরেকটি ছেলে এসেই ডেস্কের সামনে রাখা চেয়ারে বসে পড়ল এবং বলল, 'কী করতে হবে?' সজল ভাবল, এই ছেলেটি নিশ্চয়ই এখানকার সবাইকে চেনে, কিন্তু সজল তো কাউকে চেনে না, এটা ভেবেই সজলের একটু মন খারাপ হলো। কিন্তু ওই আপুটি সজলকে অবাক করে দিয়ে ঐ ছেলেটিকে বলল 'আপনার নাম কী? কেন এসেছেন? আপনাকে কে বসতে বলেছে?' ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, 'আমি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে এসেছি।'

গল্পের ছেলেটি বুঝতে পারেনি যে, অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলতে হলে, প্রথমে নিজের পরিচয় দিতে হয়, তারপর কেন কথা বলতে চায় সে উদ্দেশ্য বা কারণ জানাতে হয়। তারপর সে বসতে বললে বসতে হয় বা বসার অনুমতি চাইতে হয়। আমাদের বলা কথার মধ্যে শব্দের ব্যবহার এবং আমাদের শারীরিক ভাষা বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এইসব বিষয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কম-বেশি এগুলো জানি।

তোমার মনে কি প্রশ্ন এসেছে, ডিজিটাল প্রযুক্তি বইতে আমরা এগুলো নিয়ে কেন কথা বলছি?

যোগাযোগের এই নিয়মকানুনগুলো নিয়ে এখানে কথা বলার কারণ হচ্ছে, সাধারণ জীবনে আমরা এই বিষয়গুলো জানলেও ডিজিটাল যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা এই একই নিয়মগুলো কীভাবে কাজ করে তা একটু আলাদা করে বুঝে নিতে চাই।

তার আগে চলো আমরা একটি ভূমিকাভিনয় বা রোল-প্লে খেলি।

শ্রেণিকক্ষের দুজন দুজন করে মোট ছয়জন আমরা ভূমিকাভিনয় করব, বাকিরা তাদের অভিনয় দেখে কোন কোন অভিনয় পরিস্থিতি এবং সম্পর্ক অনুযায়ী সঠিক হচ্ছে বা হচ্ছে না সেটি বুঝে মতামত দেব।

১. ১ম জোড়া–একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অভিনয় করব (শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে ক্লাসের পরে পড়া বুঝতে গিয়েছে)।

২. ২য় জোড়া–একজন পুলিশ অফিসার এবং একজন শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অভিনয় করব (শিক্ষার্থী থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছে)।

৩. ৩য় জোড়া–একজন বন্ধু অন্য একজন বন্ধুর কাছে গতকাল রাতে টেলিভিশনে প্রচার হওয়া ফুটবল খেলার ফলাফল ও খেলা কেমন ছিল তা জানতে চাচ্ছে।

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে কিছু বিধিবদ্ধ শিষ্টাচার বজায় রেখে উপযুক্ত আচরণের মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে, অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিয়মকানুনের তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। ব্যক্তির সম্পর্ক এবং পরিস্থিতির কারণে এই ভিন্নতা তৈরি হয়। যেমন–ভাই-বোন, বাবা-মা, কাছের আত্মীয়, বন্ধু এদের সঙ্গে আমরা সাধারণত অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ করে থাকি। অন্যদিকে শিক্ষক, অপরিচিত বা অল্প পরিচিত ব্যক্তি, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়ে থাকে।

আমরা যে তিনটি ভূমিকাভিনয় করলাম এবং দেখলাম, তার মধ্যে কোনটি কী ধরনের যোগাযোগ তা টিক চিহ্ন দেই।

	আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ	অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ
শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ		
পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর যোগাযোগ		
দুই বন্ধুর মধ্যে যোগাযোগ		

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

ভূমিকাভিনয়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগের সময় কোনো ভুল হয়েছিল কি না, আর ভুল হলে সেটি কী ধরনের ভুল তা নিচের ছকে লিখি। আমাদের সুবিধার্থে নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। আমরা কমপক্ষে আরও পাঁচটি ভুল নিচের ছকে লিখব। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেও খুঁজে বের করতে পারি।

১. শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগের সময় প্রথমে কুশল বিনিময় করেনি।
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

সেশন–২: যোগাযোগের মাধ্যম বা চ্যানেল

আমরা যখন সামনাসামনি একে অন্যের সঙ্গে কথা বলি বা মৌখিক যোগাযোগ করি, তখন শব্দের সৃষ্টি হয় এবং আর এই শব্দ প্রবাহিত হয় বাতাসের মাধ্যমে। তাই এখানে বাতাস হচ্ছে একটি 'মাধ্যম'। যা ব্যবহার করে প্রাপক ও প্রেরক একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তা হলো মাধ্যম। যেমন–চিঠি, টেলিফোন ও ইন্টারনেট হলো মাধ্যম।

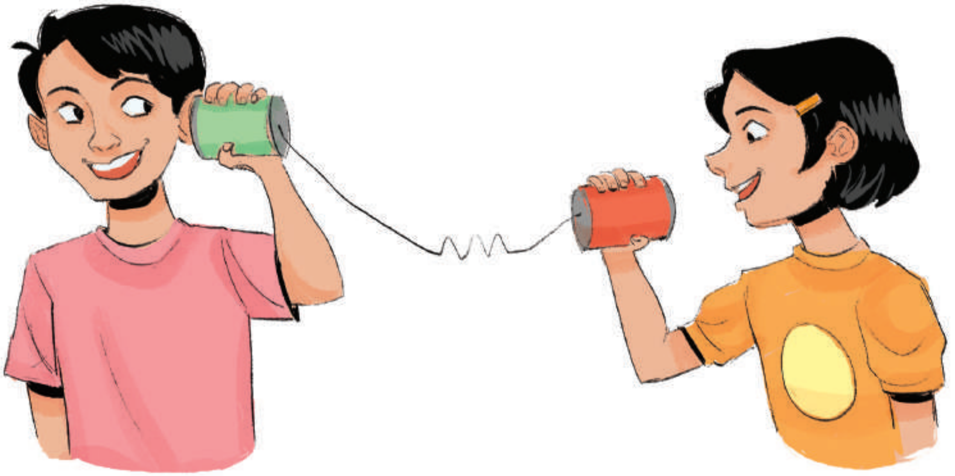

অতীতে বিদ্যুৎ এবং পরবর্তী সময়ে ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে আমাদের যোগাযোগের জন্য অনেক মাধ্যম তৈরি হয়েছে। টেলিভিশন, রেডিও, টেলিফোন এগুলোর কথা তো আমরা সবাই জানি, কিন্তু ইন্টারনেট সুবিধা নিয়ে আমরা নিয়মিত আরও কিছু মাধ্যম ব্যবহার করি। যেমন–

১. ই-মেইল

২. ওয়েবসাইট

৩. অডিও এবং ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যম

৪. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

৫. ব্লগ

৬. ভ্লগ ইত্যাদি

আনুষ্ঠানিক বা অফিসিয়াল যোগাযোগের ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন–সরকার থেকে যখন কোনো নির্দেশনা আসে, তখন সাধারণত এটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে ছাপা হয় আবার ওয়েবসাইটে রাখা হয় যেন সকল মানুষ সেটি জানতে পারে। অনেক সময় ফোনে এসএমএস আসে। তাছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে সকল সরকারি যোগাযোগ এখনো ডাকের মাধ্যমেই হয়। কারণ দেশের সবার কাছে তো ইন্টারনেট নেই!

কিন্তু আমরা যখন খুব ছোট পরিসরে যোগাযোগ করি, তখন যদি আমাদের ইন্টারনেট সুবিধা থাকে তাহলে কোন মাধ্যম ব্যবহার করা সবচেয়ে সঠিক বা সমীচীন হবে?

নিচের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে সঠিক মাধ্যম কোনটি হতে পারে সেটিতে টিক (√) দিব। একটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

১. উপজেলা শিক্ষা অফিসে বৃত্তির আবেদনের সঠিক নিয়ম জানতে চাইলে–	ক. ইমেইল করব √ খ. ফোন দেব গ. মেসেঞ্জারে টেক্সট পাঠাব
২. শিক্ষকের কাছে আগামীদিনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে যোগাযোগ করতে চাইলে–	ক. ভিডিও কল দেব, খ. এসএমএস করব গ. ব্লগ বানাব
৩. বন্ধুর কাছে আগামীকালের বাড়ির কাজ জানতে যোগাযোগ করতে হলে–	ক. অডিও কল দেব খ. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখব গ. ইমেইল করব
৪. নিজের উপজেলায় পরিবেশ দিবস পালন উপলক্ষে আন্তঃউপজেলা পরিবেশ মেলার আয়োজন করার জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট আবেদন করব যেভাবে–	ক. টেক্সট পাঠাব খ. অডিও কল দেব গ. ই-মেইল করব

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

আমরা এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, সবাই মিলে আমাদের আশপাশের এমন একটি সমস্যা চিহ্নিত করব যেটির সমাধান একা করা প্রায় অসম্ভব। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তার প্রয়োজন হবে। আমরা আজ বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে এমন একটি সমস্যা খুঁজে বের করব। সমস্যাটি এরকম হতে পারে–

বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা মেরামত, বিদ্যালয়ের পাশের বাঁধ নির্মাণ, বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা পারাপারের ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ, বিদ্যালয়ের পাশে ডাস্টবিন তৈরি, বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য টিউবওয়েল বসানো ইত্যাদি। এই উদাহরণগুলো বোঝার সুবিধার্থে দেওয়া হলো, তুমি তোমার বিদ্যালয়ের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা খুঁজে বের করবে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সেশন–৩: যোগাযোগ ও ভাষার ব্যবহার

এক ছুটির দিনে বাবা-মা বাড়ির কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত! আমিও বাবা-মাকে সাহায্য করে ক্লান্ত হয়ে বসে বসে বই পড়ছিলাম। হঠাৎ বাবা এসে বললেন, 'সূচী, চুলায় ভাত বসিয়েছি, তুমি রান্নাঘরের পাশে বসে গল্পের বই পড়ো আর ভাতগুলো দেখে রেখো। আমি পড়ছি, ভাত রান্না হচ্ছে। ওদিকে এ সময় ভাতের পাতিলের ওপর অনেক ফেনা উঠে পাতিলের ঢাকনা পড়ে গেল, কিছুক্ষণ পর ভাত পোড়া গন্ধ পেলাম। তখনো আমি কিছু জানি না, পড়ছি। একটু পর মা এসে তাড়াতাড়ি ভাতের পাতিল নামালেন আর আমাকে খুব বকা দিলেন। আমি বুঝলাম না, মা এত রেগে গেলেন কেন? আমাকে ভাত দেখতে বলেছে, আমি তো দেখছিলাম! এক মিনিট পরপরই নিয়ম করে বই থেকে চোখ তুলে ভাতের পাতিল দেখছিলাম!

এই ধরনের কৌতুক আমরা প্রায় শুনি, তাই না? 'ভাত দেখে রাখা' মানে হচ্ছে 'ভাত হয়ে গেলে নামিয়ে ফেলা' এটি আমরা সবাই বুঝি। কিন্তু এমন অনেক শব্দ আছে হয়তো দুই দেশে বা দুই জেলায় দুই রকমের অর্থ বোঝায়। তাই যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা যার সঙ্গে যোগাযোগ করছি, সে যেন আমার বার্তা বা মেসেজের অর্থ বুঝতে পারে তা আমাদের লক্ষ রাখতে হয়।

যোগাযোগের প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির নিজস্বতা : যোগাযোগ নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তারা মনে করেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক উপাদান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যার সঙ্গে যোগাযোগ করব তার সংস্কৃতি, কোনো কিছু বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি, তার সামাজিক আচার-আচরণ বুঝে তারপর তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়, তা না হলে আমার যোগাযোগটি সফল হবে না।

চিত্র: ক

প্রেরক/Sender বার্তা/Message মাধ্যম/Channel প্রাপক/Receiver

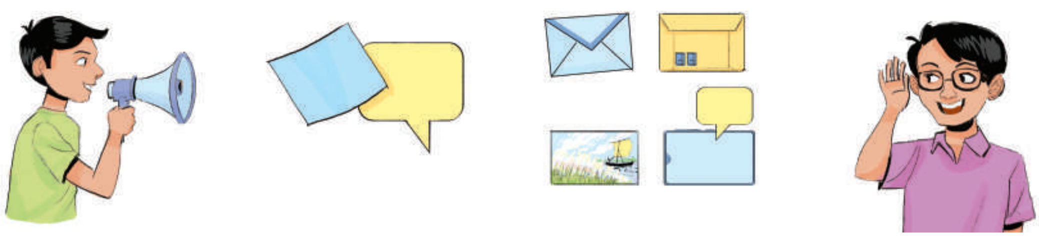

প্রেরক/Sender	প্রাপক/Receiver
১. যোগাযোগের দক্ষতা	১. যোগাযোগের দক্ষতা
২. দৃষ্টিভঙ্গি	২. দৃষ্টিভঙ্গি
৩. জ্ঞান	৩. জ্ঞান
৪. সামাজিক রীতিনীতি	৪. সামাজিক রীতিনীতি
৫. সংস্কৃতি	৫. সংস্কৃতি

এখানে বোঝাতে চেয়েছে, একজন ব্যক্তি যখন অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, তখন তাদের

উভয়পক্ষের যোগাযোগ দক্ষতা, চিন্তার ধরন, জ্ঞান, তাদের সমাজে প্রচলিত নিয়মকানুন এবং সংস্কৃতি যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। যেমন–একজন শিশু, যে কেবল কয়েকটি শব্দ বলতে শিখেছে, তাকে যদি গিয়ে আমি বলি, 'আমি টিফিন ব্রেকের সময় স্কুল থেকে চলে আসব, তারপর তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব।' সে হয়তো টিফিন ব্রেক শব্দটির সঙ্গে পরিচিতই নয়, তাই সে বুঝবেই না আমি কী বলতে চাচ্ছি। আবার ধরি, একজন নতুন রিকশাচালক যিনি ট্রাফিক নিয়মকানুন কিছুই জানেন না, তাকে বললাম, 'আপনি জেব্রাক্রসিং-এর সামনে রিকশা থামাবেন।' তিনি কি বুঝতে পারবেন?

তাই যার বা যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব তাদেরকে বুঝে নেওয়াটা জরুরি, তা না হলে সফলভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না।

আনুষ্ঠানিক বা ফরমাল যোগাযোগে ভাষার ব্যবহার : আমরা আমাদের বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলি, শিক্ষকের সঙ্গে সেভাবে কথা বলি না। এটি আমরা এর আগে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পেরেছি। কিন্তু আমরা যদি কারও সঙ্গে লিখিতভাবে আনুষ্ঠানিক বা অফিসিয়াল প্রথায় যোগাযোগ করি, তাহলে বাক্যের গঠন কিছুটা আলাদা হবে–

অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ-বন্ধু বা সমবয়সিদের সঙ্গে	বয়োজ্যেষ্ঠ বা অল্প পরিচিত মানুষের সঙ্গে	আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ-লিখিত আকারে
কী অবস্থা?	আপনি ভালো আছেন?	আশা করি আপনি সুস্থ আছেন।
এ কাজ আমি এখন করতে পারব না।	আমার পক্ষে এত অল্প সময়ে কাজটি করা সম্ভব হবে না।	যদি কিছু মনে না করেন, আমি কি কাজটি করার জন্য আর দুই দিন সময় পেতে পারি?
গতকাল তুমি ফোন ধরোনি কেন?	আমি গতকাল আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম, আমার একটু জরুরি কথা ছিল। আমি কি কথাটি এখন বলতে পারি?	গতকাল আমি একটি জরুরি বিষয় জানাতে ফোন দিয়েছিলাম। আপনি সম্ভবত ব্যস্ত ছিলেন। আমি আজ কখন ফোন দিলে আপনার সুবিধা হবে?
চল বন্ধু ছবি তুলি	আমি কি আপনার সঙ্গে একটি ছবি তুলতে পারি?	আগামীকাল অনুষ্ঠান শেষে আমরা সবাই আপনার সঙ্গে ছবি তোলার ইচ্ছা পোষণ করছি। আশা করি আপনি আমাদের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য সুযোগ দেবেন।

এবার আমরা একটি খেলা খেলব–

তোমরা কি কখনো গানের কলি খেলেছ? একদল একটি গান গায়, সে গানের শেষের অক্ষর দিয়ে অন্যদলকে আরেকটি গান গাইতে হয়। আজকের খেলাটি অনেকটা সে রকম। শ্রেণিকক্ষের সবাই দুই দলে ভাগ হয়ে একদল একটি অনানুষ্ঠানিক ধারার বাক্য বলবে, অন্য দল সে বাক্যটি আনুষ্ঠানিকভাবে বললে কেমন হতে পারে তা বলবে। বলার পর তারা আবার অন্যদলকে একটি অনানুষ্ঠানিক ধারার বাক্য দেবে। তারা আবার ঐ বাক্যটি আনুষ্ঠানিক ধারার হলে কেমন হবে তা বলবে। একটি বাক্য রূপান্তর করার জন্য প্রতিটি দল এক মিনিট করে সময় পাবে।

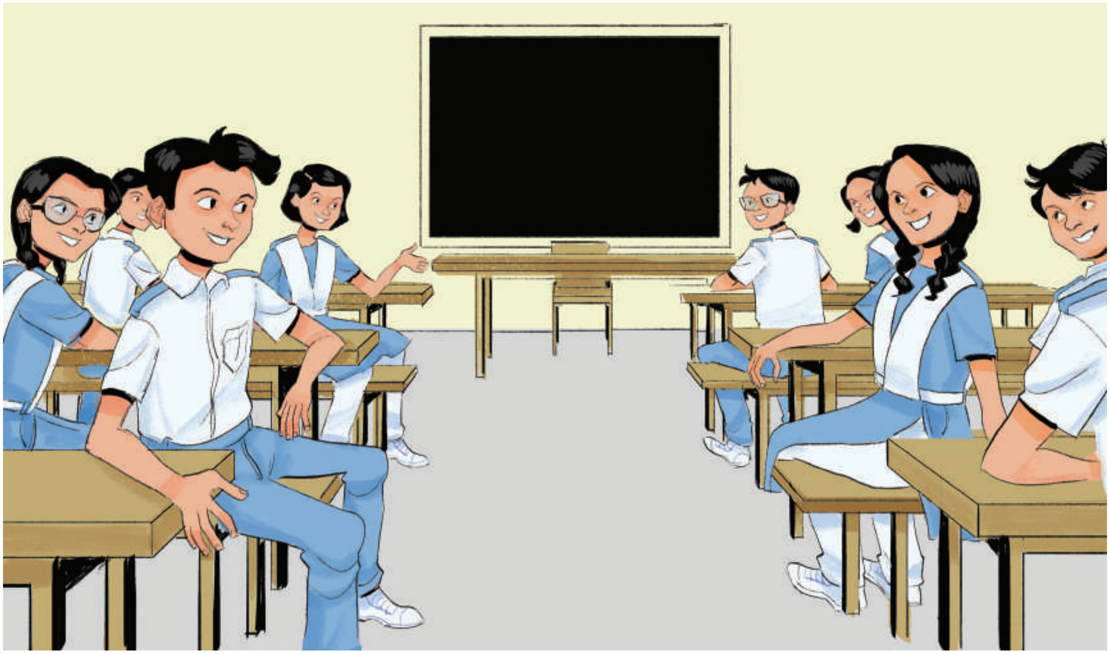

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

আমার চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান কে বা কারা হতে পারে তা ভেবে বের করব।

সেশন–৪: আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের প্রস্তুতি

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের প্রচলিত মাধ্যম হচ্ছে দরখাস্ত অথবা চিঠি। আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কোনো বিষয়ে আবেদন জানানোর জন্য সাধারণত দরখাস্ত লিখে থাকি। তবে এখন যেহেতু আমাদের ঘরে ঘরে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে যাচ্ছে, তাই আমরা একই যোগাযোগটি ই-মেইলের মাধ্যমে করতে পারি। ই-মেইল লেখার জন্য যে খুটিনাটি বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন, আজ আমরা একটু দেখে নেব।

আমাদের কি মনে আছে আমাদের আশপাশের কোন একটি সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন জানাতে হয়? হ্যাঁ, আজকে এই বিষয়েই আমরা ই-মেইল লেখার প্রস্তুতি সম্পন্ন করব।

ইমেইলের সুবিধা হচ্ছে–

১। আমরা খুব দ্রুত যোগাযোগ করতে পারি।

২। একই সঙ্গে একাধিক ব্যক্তিকে একই ই-মেইল পাঠাতে পারি। (কয়েকটি সুবিধা নিজে খুঁজে বের করে লিখব)

৩। অনেক কম খরচে যোগাযোগ করতে পারি।

৪। আমার ই-মেইলটি যে ব্যক্তিকে পাঠাচ্ছি, সে ব্যক্তি ছাড়া আমি না চাইলে অন্য কোন ব্যক্তি আমার ই-মেইলটি দেখে ফেলার ঝুঁকি কম। চিঠির ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা বেশি থাকত।

৫। ই-মেইলে আমি বড় কোনো ফাইল বা ছবি যুক্ত করতে পারি।

৬। আমি চাইলে একই সঙ্গে একাধিক ব্যক্তিকে ই-মেইল পাঠাতে পারি; কিন্তু এটিও ঠিক করে দিতে পারি, আমার প্রাপকরা জানবে না আমি কাকে কাকে ওই একই ই-মেইল পাঠাচ্ছি।

আমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে জেনেছি–

- 'To' ঘরে আমার প্রাপকের ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হবে।
- 'Subject' ঘরে আমি যে বিষয়ে ই-মেইল লিখতে চাই সেই বিষয় লিখব। অনেকটা দরখাস্ত বা আবেদনপত্রে যেভাবে বিষয় লিখি।
- 'Compose Email/Body' ঘরে আমার পুরো ই-মেইলটি লিখব। 'Subject' ঘরের নিচে এটি থাকে।
- 📎 'Attachement'-এ ক্লিক করে আমরা ই-মেইলের সঙ্গে কোনো ফাইল বা ছবি পাঠাতে হলে তা যুক্ত করব।

আমরা ই-মেইলের আরও কিছু ফিচার জানব।

বিশ্বে অনেকগুলো ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ই-মেইল সেবা রয়েছে।

যেমন-জিমেইল, ইয়াহু, আউটলুক ইত্যাদি। আবার আমরা যখন নিজেদের জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি করব তখন ওই ওয়েবসাইটেও আলাদা করে ই-মেইল সেবা যোগ করতে পারব।

সব ই-মেইলেই কিছু সাধারণ বা প্রচলিত ফিচার থাকে যেগুলো বিভিন্ন ই-মেইলের ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম। এ রকম কিছু ফিচার একটু দেখে নেই।

1. 'New/Compose'-এ ক্লিক করে আমার ই-মেইল লেখা শুরু করতে পারি। অর্থাৎ এখানে ক্লিক করলে ই-মেইল লেখার জন্য একটি বক্স আসবে। এটিকে কলমের মতো সাংকেতিক চিহ্ন দিয়েও বোঝানো হয়।

2. 'Inbox'-এ আমার ই-মেইলে অন্য কেউ যদি ই-মেইল পাঠায়, সেগুলো জমা হয়ে থাকে।

3. 'Sent' বক্সে আমি যা যা ই-মেইল পাঠাব সেগুলো জমা থাকবে।

4. 'Junk/Spam' ভিন্ন ভিন্ন ই-মেইলে এই বক্স বা ফোল্ডারটি ভিন্ন নামে থাকে। এই বক্সটি থেকে একটু সাবধানে থাকা প্রয়োজন। প্রতারণা করার জন্য অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু ই-মেইল পাঠিয়ে থাকে, যেখানে অর্থ, লটারি বা লোভনীয় কোনো পণ্য প্রাপ্তির লোভ দেখায়। এই ধরনের ই-মেইল এখানে এসে জমা হয়। তাই এই ই-মেইলগুলোর কোনো উত্তর বা প্রতিক্রিয়া দিতে হয় না, কোনো লিংক থাকলে সে লিংককেও ক্লিক করা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত না হব যে ই-মেইল পাঠিয়েছে, তাকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে এবং তার উদ্দেশ্য কী তা বোঝা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ই-মেইলটি ক্লিক করব না বা 'Reply' দেব না।

5. 'Draft' বক্স আমি কোনো ই-মেইল লিখে সেইভ বা জমা করে রাখতে পারি। একটি ই-মেইল লেখার মাঝপথে মনে হলো আমি ই-মেইলটি পরে পাঠালে ভালো হয়, তখন আমি এটিকে ড্রাফট বক্সে রেখে দিতে পারি।

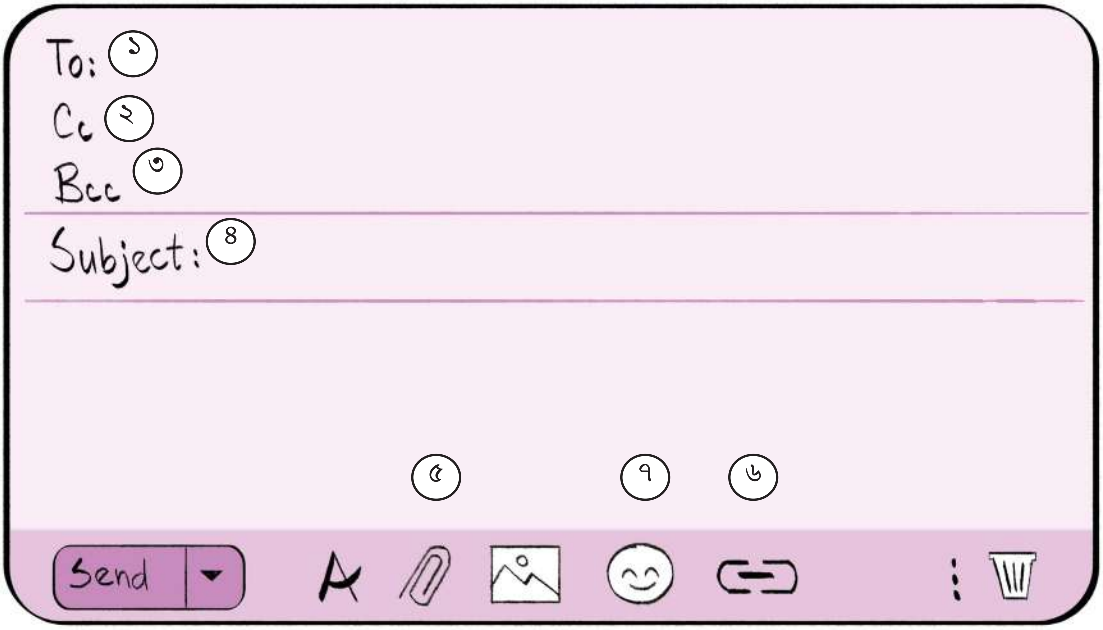

১. 'To'তে আমি যার কাছে ই-মেইল করছি তার ঠিকানা লিখতে হবে, তা আমরা ইতোমধ্যে জানি।

২. 'CC' অর্থ হচ্ছে কার্বন কপি। আমি একজনকে ই-মেইল করছি সেটি যদি অন্যজনকে অবহিত করে রাখতে চাই, তাহলে যাকে অবহিত করে রাখতে চাই তার ঠিকানা 'CC'তে দিব। যেমন–আমি আমার প্রধান শিক্ষকের কাছে ছুটির আবেদন করব, আমি যে আবেদন করছি সেটি আমার শ্রেণি শিক্ষকের জানা প্রয়োক জন, তাই আমি তাকে 'CC' তে রাখতে পারি, যেন তিনিও অবহিত থাকেন আমি ছুটির আবেদন করছি। আনুষ্ঠানিক বা ফরমাল যোগাযোগে CC ব্যবহার করা ভালো। একই সঙ্গে অনেকজনকে CC করা যায়।

৩. 'BCC' সাধারণত একসঙ্গে অনেক মানুষকে পাঠালে তখন ব্যবহার করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য আমার একজন প্রাপক অন্য প্রাপকের ই-মেইল ঠিকানা জানবে না এবং কাকে কাকে পাঠানো হচ্ছে তা অন্যরা জানবে না। ই-মেইল ঠিকানাও একটি ব্যক্তিগত তথ্য। ধরি, আমি আমার বিদ্যালয়ের ১০০ জন শিক্ষার্থীকে একটি ই-মেইল করব। ১০০ জনের ই-মেইল ঠিকানা 'TO/CC'তে দিলে সবাই সবার ঠিকানা জেনে যাবে, যেটি ঠিক হবে না, এমন পরিস্থিতিতে আমি ১০০ জনকে 'BCC'তে রাখতে পারি।

৪. সাবজেক্ট/বিষয়-এর কাজ কী আমি লিখি..

৫. 'অ্যাটাচমেন্ট'-এর কাজ কী আমি লিখি ....

৬. আমি যদি আমার ই-মেইলে কোনো ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিতে চাই তাহলে আমার মূল ই-মেইলের যে অংশে বা যে শব্দটির মধ্যে লিংকটি রাখতে চাই, সে শব্দটি ক্লিক করে উপরের ছবিতে দেখানো ৬ নম্বর প্রতীকটির উপর ক্লিক করব, ক্লিক করলে একটি বক্স আসবে, বক্সে আমি আমার ওয়েবসাইটের লিংকটি যোগ (paste) করব।

৭. আমরা সাধারণত বেশি কথা বা অনুভূতি অল্পকথায় প্রকাশ করতে ইমোজি ব্যবহার করি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এখানে ক্লিক করলে ইমোজি পাওয়া যাবে। তবে দাপ্তরিক যোগাযোগ বা অফিসিয়াল যোগাযোগে ইমোজি ব্যবহার না করাই ভালো।

৮. লেখা শেষে আরেকবার দেখে নেব যেন কোনো বানান ভুল বা বাক্য ভুল না থাকে।

৯. Send বাটনে ক্লিক করে ই-মেইলটি প্রাপকের কাছে পাঠিয়ে দিব বা Send বাটনের পাশে ▽ চিহ্ন বা ড্রপডাউন মেনুতে ক্লিক করে পরবর্তী কোনো সময়ে পাঠানোর জন্য তালিকা (Schedule) করতে পারি।

<u>বাড়ির কাজ নিয়ে আলোচনা :</u>

বাড়ির কাজ হিসেবে আমার চিহ্নিত সমস্যাটি সমাধানের জন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন আমাদের সহায়তা করতে পারে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। আজকে আমরা আমাদের সমস্যা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমাধানের জন্য ব্যক্তি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের নাম শিক্ষককে জানাব। শিক্ষকের সহায়তায় আমরা ঠিক করব, কোন সমস্যাটি নিয়ে আমরা ই-মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে চাই। সবার মতামত নিয়ে আমরা যে কোনো একটি সমস্যা নির্ধারণ করব।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

আমরা আমাদের সমস্যা ও আবেদন জানিয়ে আমাদের ই-মেইলে কী লিখতে চাই তার একটা খসড়া এখানে লিখব। এখানে যে বিষয়গুলো থাকবে-

১. আমার পরিচয় ও ই-মেইল লেখার উদ্দেশ্য;

২. আমাদের সমস্যার বিস্তারিত;

৩. কীভাবে আমার প্রাপক আমাদের এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে পারেন;

৪. ধন্যবাদ।

এ ছাড়া চিত্র–ক থেকে শেখা (প্রাপকের দক্ষতা, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি) বিষয়গুলো আমরা আমাদের লেখা ই-মেইলে কীভাবে কাজে লাগিয়েছি সেটিও লিখব। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করব। কাগজটি আঠা দিয়ে খালি পৃষ্ঠার সঙ্গে জোড়া লাগাব।

..........................আঠা লাগানোর স্থান..........................

'চিত্র ক' থেকে শেখা উপাদান যেভাবে কাজে লাগিয়েছি :

সেশন–৫: ই-মেইল পাঠানোর সময় হলো

অবশেষে আজকে আমাদের ই-মেইল পাঠানোর পালা। আমরা ঠিক করে ফেলেছি আমরা কাকে ই-মেইল পাঠাতে চাই এবং ই-মেইলের খসড়াও লিখে ফেলেছি। আজকে সবাই মিলে আমরা শ্রেণিকক্ষে বসেই ই-মেইলটি লিখব। সবাই মিলে যেহেতু একটি ই-মেইল লিখব তাই যে কোনো একজনের ই-মেইল ঠিকানা আমরা ব্যবহার করব। আমাদের সবার বয়স যেহেতু এখনো ১৩ বছর হয়নি, অনেকের হয়তো ই-মেইল ঠিকানা নেই, তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে যদি আমরা আমাদের শিক্ষকের ই-মেইল ঠিকানা ব্যবহার করি। শিক্ষকের ই-মেইল ঠিকানা ব্যবহার করলেও কাজটা কিন্তু আমরাই করব।

প্রথমে আমরা একটি কাগজে (বইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠায়) ই-মেইলের মূল বক্তব্যটি লিখব। আমরা আমাদের বাড়ির কাজের খসড়া ই-মেইল থেকে লেখাগুলো নিয়ে এটি করতে পারি। এক্ষেত্রে শিক্ষকের সহায়তায় একজন ক্লাসের সামনে গিয়ে লেখার দায়িত্বটি নেবে, বাকি সবাই তাকে সাহায্য করবে। অর্থাৎ কী লিখতে হবে তা বাকিরা একটি একটি বাক্য হিসেবে প্রস্তাব করবে। (লক্ষ রাখবে শ্রেণিকক্ষে যেন হইচই না হয়)। সামনের শিক্ষার্থী যা লিখছে তা আমি নিজেও নিজের বইতে লিখব।

লেখা শেষ হলে, আমরা এবার পুরো লেখাটি কম্পিউটার ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে লিখব। আমরা যাকে ই-মেইলটি করব আমাদের শিক্ষক ইতিমধ্যে সেই প্রাপকের ইমেইল ঠিকানাটি জোগাড় করেছেন। শিক্ষক কম্পিউটার খুলে তার নিজের ই-মেইল ঠিকানাটি খুলে দেবেন, এরপর 'New E-mail/Compose'-এ ক্লিক করলে একটি নতুন বক্স আসবে। এরপর থেকে আমাদের কাজ–আমরা ই-মেইলটি লিখব। শ্রেণিকক্ষের সবাই ২/৩টি করে লাইন লেখার চেষ্টা করব। শ্রেণিকক্ষের সবাই যদি বাংলা টাইপ করতে না পারি, তাহলে যে পারে তার সহায়তায় আমরা অন্তত ২/৩টি করে শব্দ লিখব।

যদি শ্রেণিকক্ষের কেউই বাংলা টাইপ করতে না পারে, তাহলে পরবর্তী পৃষ্ঠায় যে ই-মেইলটি লেখা হয়েছে শিক্ষক সেটির ছবি তুলে দেবেন। সেই ছবি আমাদের ই-মেইলের 'অ্যাটাচমেন্ট' আকারে পাঠাব। এক্ষেত্রে ই-মেইল বডি বা মূল অংশের জায়গায় আমরা ইংরেজিতে সংক্ষেপে আমাদের পরিচয় লিখে অ্যাটাচমেন্ট দেখার অনুরোধ করব।

ই-মেইল :

To:

CC:

Subject:

*** যদি বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সুবিধা না থাকে তবে মন খারাপ করার কিছু নেই। আমাদের শিক্ষক আমাদের লেখা ই-মেইলটি চিঠির আকারে ডাকঘরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে ই-মেইলটি কাগজে লেখা হয়ে গেলে কীভাবে প্রাপক ও প্রেরকের ঠিকানা লিখতে হয় তা জেনে একটি খামে লিখব। আমাদের এবং আমাদের প্রাপকের পোস্ট কোড কত তা আমরা শিক্ষকের কাছে জেনে নেব।

অভিভাবকের কাছ থেকে তারকা সংগ্রহ:

একজন সুনাগরিক হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। আমাদের সমস্যা ও তার সমাধান চেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছি। আমাদের এই কাজ সম্পর্কে আমাদের অভিভাবক জানলে নিশ্চয়ই অনেক খুশি হবেন। আমাদের ই-মেইল/চিঠিটি বাসায় গিয়ে আমাদের অভিভাবককে পড়ে শোনাব। অভিভাবক বলবেন আমাদের লেখাটি কেমন হয়েছে। অভিভাবক তার পছন্দ অনুযায়ী ১টি থেকে ৫টি তারা আমাদের রং করে দিতে পারেন। ১টি অর্থ অল্প পছন্দ, ৫টি অর্থ অনেক বেশি পছন্দ।

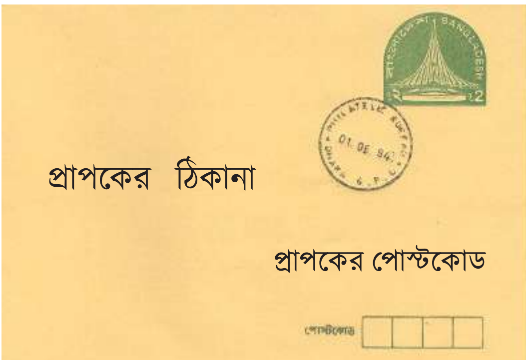

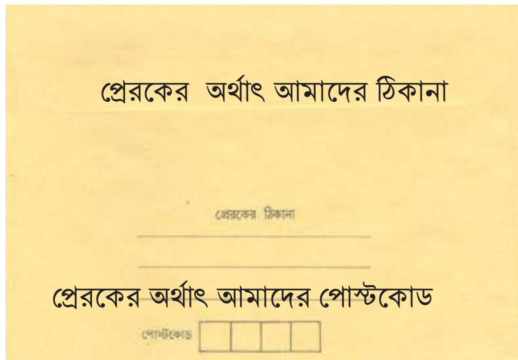

অভিভাবকের স্বাক্ষর :

শিখন অভিজ্ঞতা ৯

আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র

সেশন–১: বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য

বৈচিত্র্য বলতে আমি বুঝি বিভিন্নতা। আমরা বাংলাদেশের আটটি বিভাগ সম্পর্কে জেনে একটি স্থানীয় বৈচিত্র্যপত্র অর্জন করেছিলাম। এবার আমরা একটি আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করব। অঞ্চল বলতে আমরা বুঝি একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা কোনো স্থানের পরিধি। এটি অনেক ছোট হতে পারে আবার অনেক বড়ও হতে পারে। একটি গ্রামের যেমন নির্দিষ্ট অঞ্চল হয়, তেমনি বিশ্বেরও নির্দিষ্ট অঞ্চল হতে পারে। আমরা এবার বিশ্বের একটি অঞ্চল–দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব এবং পরিপূর্ণভাবে জানতে পারলে আমরা একটি আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র অর্জন করতে পারব। এছাড়াও বৈচিত্র্যপত্র অনুমোদন দেওয়ার জন্য আমাদের শিক্ষক এই বইয়ের শুরু থেকে আমরা যে যে প্রকল্প করেছি, সবগুলোর মূল্যায়নে গুরুত্ব দেবেন।

নিচে দক্ষিণ এশিয়ার একটি মানচিত্র দেওয়া হলো। মানচিত্রটি দেখে কি আমরা বলতে পারি কোনটি কোন দেশ?

দেশের মানচিত্রের পাশে দেশগুলোর নাম লিখি–

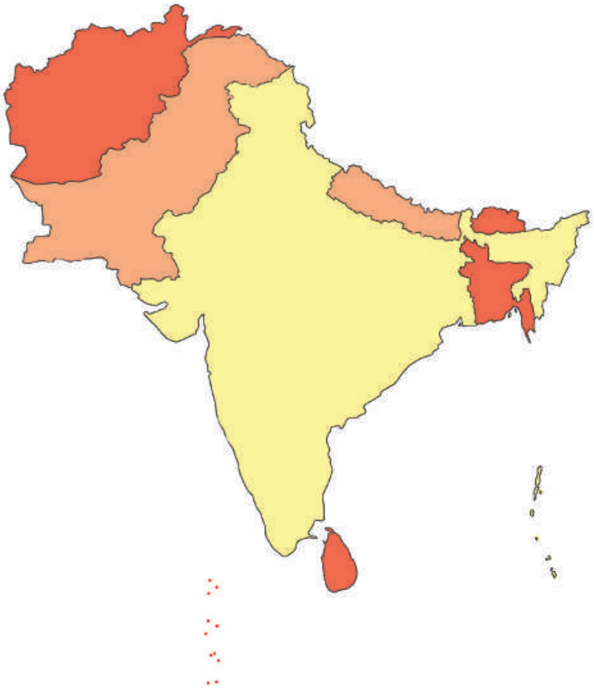

মানুষের মধ্যে যেমন মিল রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিছু অমিল। জন্মগতভাবে মানুষ কিছু মৌলিক ভিন্নতা নিয়ে জন্মায়, যেমন-গায়ের রং, দেহের আকৃতি, চেহারার ভিন্নতা। আমরা একসঙ্গে বা আলাদাভাবে বড় হওয়ার কারণে মানুষের আচার-আচরণে কিছু মিল ও অমিল তৈরি হয়। যেমন-আমাদের দেশের মধ্যেই এক এক জেলার মানুষ ভিন্ন ভিন্ন স্বরে ও উচ্চারণে বাংলায় কথা বলে, আবার বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী তাদের ভাষায় কথা বলে; কিন্তু যখন আমরা দেশকে নিয়ে কিছু চিন্তা করি, তখন আবার সবাই দেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে কাজ করি।

আমি দশ বছর পর বাংলাদেশে যে পরিবর্তন দেখতে চাই তা এক বাক্যে নিচে লিখি :

উপরের লাইনে বাংলাদেশ নিয়ে আমার এবং আমার বন্ধুর চিন্তাভাবনা মিলিয়ে দেখলে দেখব–আমরা অনেকে একইরকম ভাবনা লিখেছি, আবার অনেকে ভিন্ন কিছু লিখেছে। বিভিন্ন কারণে আমাদের আচরণ, মতামত ও চিন্তাভাবনার ভিন্নতা তৈরি হতে পারে। মনে করি, বাংলাদেশের যে অঞ্চলে আমি এখন বসবাস করছি, সে অঞ্চলে ১০০ বছর আগে অন্য একজন মানুষ বসবাস করতেন।

আমি এবং সে ১০০ বছর আগের একজন মানুষ, আমরা দুজন একই জায়গায় বসবাস করেও আমাদের আচরণ ও চিন্তাভাবনার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলো কী হতে পারে বলতে পারো?

(এই ঘরে আমার মুখের অবয়ব আঁকি)	(১০০ বছর আগের একজন মানুষের মুখের অবয়ব আঁকি)
১. আমি বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করে রাতে পড়তে বসি। ২. আমি মোটরচালিত গাড়িতে চড়ি। ৩. ৪. ৫.	১. তাঁর সময়ে বিদ্যুৎ ছিল না। ২. তিনি হয়তো গরুর গাড়িতে চড়তেন। ৩. ৪. ৫.

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

উপরের খালি জায়গায় আমার আর ১০০ বছর আগের একজন মানুষের মধ্যে যা যা পার্থক্য আছে বলে মনে হয় তা লিখব। পার্থক্যগুলো লেখার সময় লক্ষ রাখব সেগুলো যেন আচরণ ও চিন্তা-ভাবনার পার্থক্য হয়। তার এবং আমার বাহ্যিক রূপ (দেখতে কেমন) নিয়ে পার্থক্য লিখতে হবে না।

সেশন–২: প্রযুক্তির পরিবর্তন

প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তার প্রতিদিনের জীবন যাপন অনেক সহজ করছে, আরও উন্নত করছে। গত দিনের বাড়ির কাজ করতে গিয়ে আমরা একটি জিনিস লক্ষ করেছি যে, আমার আর ১০০ বছর আগের একজন মানুষের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো রয়েছে, তার অধিকাংশই প্রযুক্তির পরিবর্তনের মাধ্যমেই হয়েছে?

আরেকটি ব্যাপার লক্ষ করলে বুঝতে পারব, আমাদের দুজনের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো আমি দেখতে পেলাম সেগুলো অনেকাংশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হলো মানুষের জীবন আচরণের পরিবর্তন।

যেমন–এক সময় সবাই তাঁতের পোশাক পরত। হাতে চালানো তাঁতে কাপড় তৈরি করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়, যার কারণে এর দামও অনেক বেশি ছিল। যখন সুতা ও কাপড় তৈরির প্রযুক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হলো, তখন অল্প সময়ে অনেক বেশি কাপড় উৎপাদন সম্ভব হয়ে গেল। মানুষও অনেক অল্প খরচে কাপড় কিনতে শুরু করল আর সুতির কাপড় ছাড়াও তারা (নাইলন, পলিয়েস্টার) কাপড়ের নানান রং ও ডিজাইনের সিনথেটিক কাপড় পরতে শুরু করল। পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে মানুষের আচরণের এই পরিবর্তন প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

এক সময় ভারতীয় উপমহাদেশে ধুতি বা লুঙ্গিজাতীয় পোশাকই ছিল পুরুষদের প্রধান পোশাক। ইংরেজরা এই অঞ্চল যখন শাসন করে, তখন তারা এখানকার পুরুষদের তাদের পোশাক ‘প্যান্ট’ পরতে উৎসাহী করে বা কখনো কখনো বাধ্য করে। এক সময় এই প্যান্টই হয়ে যায় পুরুষদের জন্য আনুষ্ঠানিক পোশাক। আমরা এখন কাউকে ধুতি বা লুঙ্গি পরে স্কুল বা অফিসে যেতে দেখি না। মানুষের ভিন্ন ধরনের পোশাক পরার এই পরিবর্তন প্রযুক্তির চেয়েও রাজনৈতিক এবং শাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত।

কিছু কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আমাদের জীবনাচরণের মধ্যে এমন ভিন্নতা বা নতুনত্ব নিয়ে আসে যা আমাদের চমকে দেয়। অনেকে এই পরিবর্তন সহজে মেনে নিতে পারে না; আবার অনেকে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়।

নিচে কিছু পরিবর্তন দেওয়া হলো। কিছু পরিবর্তন তুমি নিজের কল্পনাশক্তি কাজে লাগিয়ে চিন্তা করে লিখবে যে ভবিষ্যতে কী বা কেমন পরিবর্তন আমাদের জীবনে আসতে পারে।

আর পাশের দুই ঘরের মধ্যে এক ঘরে তুমি ওই পরিবর্তন সম্পর্কে মতামত দিবে। তোমার যদি মনে হয় পরিবর্তনটি ইতিবাচক বা ভালো, তাহলে টিক (√) আর যদি মনে হয় এটি ভালো পরিবর্তন নয় তাহলে ক্রস (✕) দিবে। অন্য আরেকটি ঘরে তোমার পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণ সদস্য যেমন–দাদা-দাদি, নানা-নানি তাদের মতামত নিয়ে তুমি √ বা ✕ দিবে। বাড়িতে গিয়ে পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের মতামতগুলো তোমরা জেনে √ বা ✕ দিয়ে সর্বডানের ঘরটি পূরণ করবে।

সারণি ৯.১

পরিবর্তন	আমার মতামত	পরিবারের প্রবীণ সদস্যের মতামত
১. বাজার থেকে মাছ বা ফলমূল কিনতে প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার		
২. পড়াশোনা বুঝতে ইন্টারনেটের ব্যবহার		
৩. মঞ্চের পালাগান বা নাটকের পরিবর্তে ইন্টারনেটে বিনোদন নেওয়া		
৪. মাঠে খেলার পরিবর্তে মোবাইল ফোন সেটে ভিডিও গেমস খেলা		
৫. উড়োজাহাজে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া		
৬. ইন্টারনেট ব্যবহার করে ভিডিও কলে কথা বলা		
৭. মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বাজার করা		
৮. ইন্টারনেটে ভিডিও দেখে কোনো রোগের চিকিৎসা করা		
৯.		
১০.		
১১.		
১২.		
১৩.		
১৪.		

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

১. উপরের সারণির একেবারে ডান পাশের কলামে তোমার পরিবারের প্রবীণ সদস্যের মতামত নিয়ে √ বা × দেবে।

২. তোমার বাবা-মা বা অভিভাবকের সময় আর তোমার সময়ে জীবনযাপনের মধ্যে কী পার্থক্য তা তাদের সঙ্গে গল্প করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং নিচের খালি জায়গায় লিখবে।

আমার এবং আমার অভিভাবকের সময়ের জীবনযাপনের মধ্যে পার্থক্য :

এই পার্থক্যে কি প্রযুক্তির কোনো ভূমিকা আছে?

থাকলে কী কী?

সেশন–৩: মতামতের পার্থক্য ও যুক্তির খেলা

আমরা গত দিন একটি কাজ করেছিলাম, যেখানে প্রযুক্তির কোন কোন পরিবর্তন আমার ভালো লাগে আর কোনগুলো আমার ভালো লাগে না সেই বিষয়ে মতামত দিয়েছি। একটু লক্ষ করলে বুঝতে পারব আমার মতামত আর আমার বন্ধুর মতামত কিছু কিছু জায়গায় ভিন্ন আবার আমার আর আমার পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের মতামতও কিছুটা ভিন্ন।

একটি কাজ করলে কেমন হয়, আমরা গত দিন সারণি ৯.১-এ কিছু পরিবর্তনের কথা বলেছি এবং নিজেদের মতামত দিয়েছি–কোনটি ভালো পরিবর্তন আর কোনটি নয়। এখন শ্রেণিকক্ষের সকল জোড় রোল/আইডি নাম্বারের সবাই 'নেতিবাচক পক্ষ' এবং বিজোড় নাম্বারের সবাই 'ইতিবাচক পক্ষ' হয়ে দুই দল হয়ে যাবে। (সবাই যার জায়গায় বসে থাকব, স্থান পরিবর্তন করতে হবে না)।

এখন শিক্ষক একটি একটি করে পরিবর্তনের কথা বলবেন। আর জোড় রোল নাম্বারের সবাই একজন করে হাত তুলে ঐ পরিবর্তনটি যে নেতিবাচক পরিবর্তন তা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে বিজোড় রোল নাম্বারের সবাই একজন করে হাত তুলে ঐ পরিবর্তনটি যে ইতিবাচক পরিবর্তন তা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে।

উদাহরণ :

শিক্ষক : বাজার থেকে মাছ বা ফলমূল কিনতে প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার।

জোড় রোল নাম্বার : এটি ভালো পরিবর্তন নয়, এতে পরিবেশ দূষিত হয়।

বিজোড় রোল নাম্বার : এটি ভালো পরিবর্তন, কারণ এতে আমাদের জীবনে বিভিন্ন উপকার হয়েছে।

যুক্তির খেলা শুরু করার আগে একটি বিষয় জেনে রাখা ভালো : আমাদের মধ্যে অনেক সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ তৈরি হতে পারে, একজনের পছন্দ বা মতামত আমার অপছন্দ হতে পারে, না মিলতে পারে।

এরকম হলে আমাদের মতের পক্ষে নিজেদের যুক্তি তুলে ধরব, কিন্তু কোনভাবেই একে অন্যকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করব না। নিজের মতামতকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য আমরা যখন অন্যকে হেয় করে বা আক্রমণ করে কথা বলি, তখন এটিকে বলে বিদ্বেষ ছড়ানো। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এটি অনেকে করে থাকেন, আবার ইন্টারনেট ব্যবহার করেও এটি অনেকে করে থাকেন। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ালে সেটির ভয়াবহতা আরও অনেক গুণ বেড়ে যায়।

তাই আমরা আমাদের যুক্তি-তর্কের সময় লক্ষ রাখব, কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা মুখের কথায় আঘাত করে নয়, যুক্তি দিয়ে এবং তথ্য দিয়ে আমাদের মতামত প্রতিষ্ঠা করার বা সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করব।

.... যুক্তির খেলা ....

যুক্তির খেলায় আমি হাত তুলে শিক্ষকের বলা পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে যে যে যুক্তি দিয়েছি

১.

২.

৩.

দলগঠন: আমাদের কথা ছিল আমরা একটি দক্ষিণ এশিয়া মেলার আয়োজন করব। এখন শিক্ষক আমাদের ৭টি দলে ভাগ করে দেবেন। প্রতিটি দলকে শিক্ষক একটি করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাছাই করে দেবেন। আমাদের কাজ হবে প্রযুক্তির পরিবর্তনের ফলে ওই দেশে কী পরিবর্তন হয়েছে যেটি পৃথিবীর অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশ তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে, তা খুঁজে বের করা। আমরা আজ থেকে আমার দল যে দেশ নিয়ে কাজ করবে, সে দেশ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করা শুরু করব।

নিচের তালিকা থেকে যেকোনো একটি পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দেব :

১. শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন

২. চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরিবর্তন

৩. বিনোদনে পরিবর্তন

৪. পরিবেশ ও জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষায় পরিবর্তন

৫. কর্মসংস্থানে পরিবর্তন

সেশন–৪: তথ্য খুঁজে প্রোফাইল তৈরি

আজকের সেশন আমরা শুধু তথ্য অনুসন্ধানের জন্য কাজে লাগাব এবং দলের সবাই মিলে আগামী দিনের উপস্থাপনার জন্য কে কোন অংশের কাজ করব সেটি নির্ধারণ করে নেব।

তথ্য অনুসন্ধানের উৎস হতে পারে :

১. বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি

২ পত্রিকা/বই/ম্যাগাজিন

৩. ইন্টারনেট

৪. আমার আশপাশের এমন কোনো ব্যক্তি যিনি সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন।

৫. আমার বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক।

আগামী দিনের মেলার প্রস্তুতি : আমরা শ্রেণিকক্ষের ভেতর কিংবা বাইরে নিজেদের দলের জন্য একটি বুথ বানাব (অনেকটা বিজ্ঞান মেলার বুথের মতো)। বুথে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের বিষয় উপস্থাপন করব। বুথ সাজানো এবং কনটেন্ট উপস্থাপনসহ অন্যান্য কাজের জন্য মেলা শুরুর আগেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। এ ছাড়া আমরা মেলায় বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে কী জানলাম তা লেখার জন্য একটি করে ডায়েরি বানাব।

সেশন–৫: দক্ষিণ এশিয়া মেলা

আজ আমরা শুধু কনটেন্ট উপস্থাপন করব। দলের প্রতিটি সদস্য নিজেদের স্টল/বুথের সামনে ১০-১৫ মিনিট (সদস্য সংখ্যার উপর নির্ভর করবে) করে থাকব, বাকি সদস্যরা ঘুরে ঘুরে অন্য বুথে গিয়ে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে জানবে এবং ঐ দেশ সম্পর্কে ডায়েরিতে লিখবে। উপস্থাপনকারী সদস্য স্টলে দাঁড়িয়ে থাকবে, অন্য দলের সবাই এসে তাকে প্রশ্ন করে করে ওই দেশ সম্পর্কে জেনে নেবে এবং একটি খাতায় নোট রাখবে।

আজকের উপস্থাপন শেষ হলে, আমরা বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে ডায়েরিতে আমার নিজের পর্যবেক্ষণগুলো লিখব। পরদিন এসে এই ডায়েরিটা আমাদের 'ডিজিটাল প্রযুক্তি' বিষয়ের শিক্ষকের কাছে জমা দেব। শিক্ষক আমাদের ডায়েরিটি মূল্যায়ন করে আমাদের জন্য 'আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র' প্রস্তাব করবেন এবং প্রধান শিক্ষক আমরা যারা আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র পাওয়ার যোগ্য, তাদের জন্য বৈচিত্র্যপত্র স্বাক্ষর করবেন। শিক্ষক আবার আমাদের বইটি ফেরত দেবেন, তখন আমরা আমাদের বৈচিত্র্যপত্রটি কেটে নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করব।

আমাদের ডায়েরিতে যা থাকবে : (মেলায় পাওয়া বিভিন্ন দলের

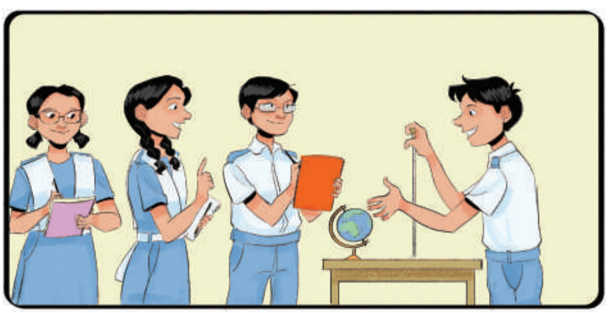

তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ডায়েরিটি লিখতে হবে)

১ . দেশের নাম (৭টি দেশ সম্পর্কে লিখতে হবে);

২. উপস্থাপন থেকে ৭টি দেশের পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে তথ্যসমূহ;

৩. পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে আমার অনুভূতি;

৪. অন্য কোনো দেশ এই পরিবর্তনগুলো থেকে যা শিখতে পারে বলে মনে করি সেসব।

....(নাম)

.... টি দেশ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য উপস্থাপন ও নিজের পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করতে পেরেছে। আমি তার প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভবিষ্যৎ কামনা করি ।

শিক্ষকের স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

হাইটেক পার্ক আইটি সংক্রান্ত সকল সামগ্রী তৈরি, আমদানি ও রপ্তানি করার সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন। বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্কসহ সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় আরও হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশই হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব পার্কে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের তরুণরা এসব কারখানায় কাজ করার ও শেখার সুযোগ পাবে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা করে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারবে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল ৭ম শ্রেণি

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত হতে হবে

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকারের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘন্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য